হাদিসে রসূল
সুন্নতে রসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আবদুস শহীদ নাসিম

ISBN: 978-984-645-058-3

হাদিসে রসূল সুন্নতে রসূল আবদুস শহীদ নাসিম, © author। প্রকাশক: বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি। পরিবেশক: শতাব্দী প্রকাশনী ৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭, ফোন: ৮৩১১২৯২। ১ম প্রকাশ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১০।

Book Title: Hadithe Rasul Sunnate Rasul Author: Abdus Shaheed Naseem, Published by Bangladesh Quran Shikkha Society, Distributor: Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Bangladesh. Phone: 8311292. First Edition: February 2010.

দাম: ১৯.০০ টাকা মাত্র। Price Tk.: 19.00 Only

সূচিপত্র

০১.	মানুষের জ্ঞান অর্জনের দরকার কেন?	৩
০২.	ভুল জ্ঞান ও সঠিক জ্ঞান	৩
০৩.	সেই নির্ণায়ক (criterion) জ্ঞান -এর নাম অহি	৪
০৪.	হাদিস এবং সুন্নাহ্ কী?	৪
০৫.	হাদিস কাকে বলে?	৫
০৬.	সুন্নাহ্ বা সুন্নতে রসূল সা.-এর পরিচয়	৬
০৭.	মুহাদ্দিসগণের সংজ্ঞা অনুয়ায়ী সুন্নতের উদাহরণ	৮
০৮.	হাদিস ও সুন্নাহ্র সম্পর্ক	৮
০৯.	সুন্নতে রসূল আদতে রসূল ও বিদ'আত	৯
১০.	কুরআনের অহি এবং হাদিসের অহি	৯
১১.	কুরআন ও হাদিসের মধ্যে পার্থক্য	১০
১২.	হাদিসের সনদ ও মতন	১১
১৩.	হাদিস কিভাবে সংরক্ষিত হয়েছে?	১১
১৪.	হাদিসের শ্রেণী বিভাগ	১১
১৫.	হাদিস ও সুন্নাহ্ ইসলামি শরিয়ার দ্বিতীয় উৎস	১৪
১৬.	হাদিস ছাড়া ইসলাম পালন করাই সম্ভব নয়	১৬
১৭.	মওদু বা মনগড়া জাল হাদিস	১৭
১৮.	হাদিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ	১৮
১৯.	হাদিস সংরক্ষণ এবং দুর্বল ও জাল হাদিস চিহ্নিত করণ	১৯
২০.	হাদিস সংরক্ষণের সোনালি ইতিহাস	২১
	ক. প্রথম অধ্যায়	২১
	খ. দ্বিতীয় অধ্যায়	২৫
	গ. তৃতীয় অধ্যায়	২৬
	ঘ. চতুর্থ অধ্যায়	৩১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হাদিসে রসূল ও সুন্নতে রসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হাদিস হলো ইসলামকে জানার ও বুঝার এবং ইসলামের ভিত্তিতে জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহ তায়ালার বার্তাবাহক (রসূলুল্লাহ সা.) থেকে প্রাপ্ত বাস্তব জ্ঞানভান্ডার।

০১. মানুষের জ্ঞান অর্জনের দরকার কেন?

- মানুষ জন্মগতভাবে জ্ঞান নিয়ে জন্মেনা। অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, চিন্তা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে সে জ্ঞান অর্জন করে। জ্ঞানার্জন না করলে বা করার সুযোগ না পেলে সে অজ্ঞই থেকে যায়।
- পশু জ্ঞান নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। মহান প্রভু আল্লাহ পাক জন্মগত বা প্রাকৃতিকভাবেই জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা তাদের প্রদান করেন।
- সুতরাং জ্ঞানার্জন করেই মানুষকে মানুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে হয়। জ্ঞানার্জন না করলে তার অবস্থান হয় পশুর চাইতেও নিচে।

০২. ভুল জ্ঞান ও সঠিক জ্ঞান

মানুষ তার অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে যে জ্ঞানার্জন করে তা ভুলও হতে পারে, সঠিকও হতে পারে। একইভাবে মানুষের চিন্তা, বিবেচনা, বিশ্বাস এবং সিদ্ধান্ত ভুলও হতে পারে, সঠিকও হতে পারে।

কারণ, মানুষ অদৃশ্য জানেনা, ভবিষ্যতও জানেনা। মানুষ তার প্রকৃত কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয়েও সঠিক জ্ঞান রাখেনা। অর্থাৎ সে নিশ্চিতভাবে জানেনা- কিসে তার প্রকৃত কল্যাণ রয়েছে, আর কিসেইবা রয়েছে তার অকল্যাণ?

সে জন্যে মানুষের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, চিন্তা-গবেষণা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্যে, জ্ঞানলব্ধ বিষয়গুলোকে সঠিক প্রক্রিয়ায় কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করার নির্দেশনা জানার জন্যে এবং তার জীবন যাপনের নির্ভুল পন্থা অবগত হওয়ার জন্যে তার এমন একটি উৎসের নির্ণায়ক জ্ঞান (criterion knowledge) প্রয়োজন, যা তাকে অকাট্য সত্যে পৌঁছুতে নিশ্চিত নির্দেশনা প্রদান করবে এবং তাকে নিশ্চিত কল্যাণের পথ দেখাবে।

এই অকাট্য ও নিশ্চিত 'নির্ণায়ক জ্ঞান' মানুষ কেবল তার স্রষ্টা ও প্রভু

মহান আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই পেতে পারে, যিনি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত এবং দৃশ্য অদৃশ্য সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

০৩. সেই নির্ণায়ক (criterion) জ্ঞান -এর নাম অহি

মহান আল্লাহ সেই জ্ঞান মানুষকে দান করেছেন। সেই জ্ঞানের নাম অহি। তিনি মানুষের মধ্য থেকে নবী রসূল নিযুক্ত করে, তাদের মাধ্যমে মানুষের জন্যে এ জ্ঞান অবতীর্ণ করেছেন।

অতীত নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ অহির জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর তিনি সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি অহি নাযিল করেছেন এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ অহিকে সুসংরক্ষিত করার সুব্যবস্থা করেছেন। এখন কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্যে অহির ভান্ডার থেকে সঠিক জ্ঞান লাভের পথ উন্মুক্ত।

সকল রসূলের মতোই আখেরি রসূল মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি দুই ধরণের অহি অবতীর্ণ হয়েছে:

১. ভাষা ও বক্তব্য সম্বলিত প্রত্যক্ষ অহি অর্থাৎ আল কুরআন।
২. মর্ম ও নির্দেশনা সম্বলিত পরোক্ষ অহি যা হাদিস আকারে সংরক্ষিত রয়েছে।

প্রথমটি অর্থাৎ আল কুরআন সম্পর্কে আমরা ভিন্ন গ্রন্থে আলোচনা করেছি। আর পরোক্ষ অহি হলো হাদিস ও সুন্নাহ্‌।

০৪. হাদিস এবং সুন্নাহ্‌ কী?

মানুষের হিদায়াত বা পথ প্রদর্শনের জন্যে আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মদ সা.-কে রসূল নিযুক্ত করেন। আর হিদায়াতের গাইডবুক হিসেবে তাঁর প্রতি নাযিল করেন আল কুরআন। কুরআন মানুষকে পড়ে শুনানো এবং বুঝিয়ে দেবার দায়িত্বও তিনি রসূলের উপর অর্পন করেন। সুতরাং কুরআন বুঝিয়ে দেবার জন্যে কুরআনের ব্যাখ্যা দান করাও ছিলো রসূলের উপর আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব। আর ব্যাখ্যা তিনি নিজের মনগড়াভাবে দেননি। বরং সেটাও দিয়েছেন আল্লাহ্‌র নির্দেশেরই আলোকে। এ কারণে রসূলের উপর কুরআন ছাড়াও আরেক ধরণের অহি নাযিল করেছেন।

মানুষ কিভাবে কুরআন অনুযায়ী জীবন যাপন করবে? কিভাবে সে তার ব্যক্তি জীবন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল দিক ও বিভাগ পরিচালনা করবে? আর কিভাবেই বা সে কুরআনের আদর্শে নৈতিক কাঠামো এবং সমাজ কাঠামো গড়ার চেষ্টা সাধনা করবে? এ সকল বিষয়েই রসূলুল্লাহ সা. নির্দেশনা দান করে গেছেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় এসব বিষয়ে কর্মনীতি কর্মপন্থা অবলম্বন করে বাস্তবে দেখিয়ে গেছেন। শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। জানিয়ে দিয়ে গেছেন। রসূল হিসেবে আল্লাহ্‌র দীন অনুযায়ী জীবন যাপন করবার জন্যে তিনি কুরআন ছাড়াও যে জ্ঞান দান করে গেছেন, যেসব কর্মনীতি কর্মপন্থা বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন এবং বাস্তবে যেসব শিক্ষা প্রদান

করে গেছেন, তাই হলো সুন্নতে রসূল যা হাদিস হিসেবে সংরক্ষিত রয়েছে। কুরআনে অবশ্য সুন্নতে রসূল বা হাদিসে রসূলকে 'হিকমাহ' বলা হয়েছে। আর এই হিকমাহও যে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নাযিল হয়েছে, সে কথা স্পষ্টভাবেই বলে দেয়া হয়েছে:

وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ●

অর্থ: (হে নবী!) আর আল্লাহ তোমার প্রতি আল কিতাব এবং হিকমাহ নাযিল করেছেন। তাছাড়া তুমি যা জানতে না, তা তোমাকে শিখিয়েছেন। আসলে তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বিরাট।[১]

তাছাড়া নবী করিম সা. নিজেই বলে গেছেন:

اَلاَ اِنِّيْ اُوْتِيْتُ الْقُرْاٰنُ وَمِثْلَهُ مَعَه ●

অর্থ: জেনে রাখো, আমাকে আল কুরআন দেয়া হয়েছে আর সেই সাথে দেয়া হয়েছে অনুরূপ আরেকটি জিনিস।[২]

এই 'হিকমাহ' এবং কুরআনের অনুরূপ জিনিসটা কি? এ যে কুরআন থেকে পৃথক জিনিস, তাতো উপরোক্ত আয়াত এবং হাদিসটি থেকে সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যাচ্ছে। মূলত এই হলো 'সুন্নতে রসূল'। এই সুন্নাহ্ রসূলুল্লাহ্ সা. তাঁর কথা, কাজ, সমর্থন ও অনুমোদনের মাধ্যমে উম্মাহকে জানিয়ে, বুঝিয়ে এবং শিখিয়ে দিয়ে গেছেন, যা আমাদের কাছে এখন হাদিস আকারে সুসংরক্ষিত হয়ে আছে।

০৫. হাদিস কাকে বলে?

'হাদিস' শব্দটির আভিধানিক অর্থ- কথা, নতুন কথা, বাণী, সংবাদ, বিষয়, অভিনব ব্যাপার ইত্যাদি।

পারিভাষিক ও প্রচলিত অর্থে- নবী করিম সা.-এর কথা, কাজ, সমর্থন, আচরণ এমনকি তাঁর দৈহিক ও মানসিক কাঠামো সংক্রান্ত বিবরণকে হাদিস বলে।[৩]

পূর্বকালে সাহাবায়ে কিরামের কথা, কাজ ও সমর্থনকেও হাদিস বলা হতো। অবশ্য পরে উসূলে হাদিসে তাঁদের কথা, কাজ ও সমর্থনের নাম দেয়া হয়েছে 'আছার' এবং 'হাদিসে মওকূফ'। তাবেয়ীগণের কথা, কাজ ও সমর্থনের নাম দেয়া হয়েছে 'ফতোয়া'।[৪]

---

১. আল কুরআন, সূরা আন নিসা : আয়াত ১১৩।
২. আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।
৩. মুকাদ্দমা সহীহ আল বুখারি; মুকাদ্দমা মিশকাতুল মাসাবীহ।
৪. ইবন হাজর আসকালানী : তাওজীহুন নযর।

০৬. সুন্নাহ্ বা সুন্নতে রসূল সা.-এর পরিচয়

আরবি سُنَّةٌ শব্দটি বাংলায় 'সুন্নত' এবং 'সুন্নাহ্' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। উভয় উচ্চারণই সঠিক।

ইবনুল মানযূর তাঁর বিখ্যাত লিসানুল আরব গ্রন্থে বলেছেন: 'সুন্নত' মানে ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রতিকৃতি; পন্থা-পদ্ধতি, বিধি বিধান, নিয়ম কানুন, জীবন পদ্ধতি, কর্মকৌশল, কর্মপন্থা- চাই তা প্রশংসনীয় হোক বা নিন্দনীয়। এর উহাহরণ হলো সহীহ মুসলিমের নিম্নোক্ত হাদিস:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،

وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ •

অর্থ: যে ব্যক্তি একটি উত্তম সুন্নতের প্রচলন করলো, সে সেটার পুরস্কার লাভ করবে এবং যারা কিয়ামত পর্যন্ত সেই সুন্নতের অনুসরণ করলো, তাদের আমলের পুরস্কারও লাভ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি মন্দ-নিকৃষ্ট সুন্নতের প্রচলন করলো, সেটার দায়ভার তার উপর বর্তাবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা সেটার অনুসরণ করবে, তাদের আমলের দায়ভারও তার উপর বর্তাবে।[৫]

পারিভাষিক সংজ্ঞা নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞগণ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত করে সুন্নাহ্র সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। মুহাদ্দিস বা হাদিস বিশেষজ্ঞগণ হাদিস এবং সুন্নাহ্র একই সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁদের মতে সুন্নাহ্ হলো: "রসূলুল্লাহ্ সা.-এর বাণী, কর্ম, সম্মতি, অনুমোদন, তাঁর স্বভাব প্রকৃতি এবং তাঁর চারিত্রিক আদর্শ- চাই তা নবুয়্যত লাভের পূর্বের হোক কিংবা পরের"।[৬]

সুন্নাহ্র এই সংজ্ঞা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে হাদিস বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টিভংগিই কাজ করেছে। মূলত তাঁরাই হাদিস শিক্ষাদান, সংগ্রহ, সংকলন ও যাচাই বাছাইর কাজ করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিভংগি ছিলো মানব জাতির নেতা ও সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে আল্লাহ্র রসূলের সীরাত, জীবনাদর্শ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, স্বভাব প্রকৃতি, দৈহিক বৈশিষ্ট্য, তাঁর বাণী, কর্ম ও আচরণ সমূহের আলোচনা। তাঁদের হাদিস চর্চার সামগ্রিক ক্ষেত্রে কোন্ হাদিসগুলো শরিয়তের বিধান সম্বলিত আর কোন্গুলো সাধারণ উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বলিত- সেই বিষয়ের প্রতি তাঁদের ভ্রুক্ষেপ ছিলোনা। রসূলুল্লাহ্ সা.-এর সমগ্র জীবনাদর্শই ছিলো তাঁদের লক্ষ্য। আর সে হিসেবেই তাঁরা সুন্নাহ্র সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে রসূলুল্লাহ্ সা.এর গোটা জীবনাদর্শই

---

৫. সহীহ মুসলিম : জারির ইবনে আবদুল্লাহ আল বাজাল্লি।
৬. ড. মুস্তফা সিবায়ী : আস্ সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফি তাশরিয়ীল ইসলামি। চতুর্থ মুদ্রণ, দারুস্ সালাম, কায়রো ২০০৮ইসায়ী।

তাঁর সুন্নাহ্। তাঁরা হাদিস এবং সুন্নাহ্কে একই দৃষ্টিতে দেখেছেন।

উসুলবিদগণের (শরিয়া বিশেষজ্ঞ) পরিভাষায়: "শরিয়া প্রণেতা ও প্রবর্তক হিসেবে রসূলুল্লাহ সা. থেকে প্রাপ্ত বাণী কর্ম এবং অনুমোদনই হলো সুন্নাহ্।[৭]

এই সংজ্ঞা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের লক্ষ্য ছিলো আল্লাহ্র রসূল সা. প্রণীত ও প্রবর্তিত শরিয়ার বিধি বিধান। অর্থাৎ তাঁরা শরিয়ার বিধান সমূহকেই সুন্নত বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন রসূল সা. বলেছেন:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ •

অর্থ: 'তোমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, আমার সুন্নত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত অনুসরণ করা।'[৮]

মূলত উসূলবিদগণ রসূলুল্লাহ্ সা.-এর কর্মনীতির আলোকে শরিয়ার উৎস, শরিয়া প্রণয়ন ও শরিয়া প্রবর্তনের নীতিমালা, মুজতাহিদগণের বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করেন।

ফকীহদের পরিভাষায় সুন্নত হলো, শরিয়তের সেইসব বিধি বিধান, যেগুলোর অবস্থান ফরয এবং ওয়াজিব-এর পরে। ফকীহগণ শরিয়তের বিধান সমূহকে প্রথমত তিনভাগে বিভক্ত করেন:

১. ওয়াজিব: অর্থাৎ যেগুলো অপরিহার্য, আবশ্যকীয় এবং করণীয় (obligatory or which to be done)।
২. হারাম: যেগুলো নিষিদ্ধ (forbidden, prohibited, unlawful)।
৩. মুবাহ: বৈধ (Permitted, lawful)।

এগুলোকে তাঁরা পুনরায় গুরুত্ব অনুযায়ী বিভিন্নভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেন। তাঁরা ওয়াজিব বা শরিয়তের করণীয় বিধানগুলোকে অপরিহার্য ও গুরুত্ব অনুযায়ী এভাবে ভাগ করেন: ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল, মুস্তাহাব।

এ আলোচনার সারমর্ম হলো, ক্ষেত্র অনুযায়ী সুন্নতের পরিচয় তিন প্রকার:

১. মুহাদ্দিস বা হাদিস বিশারদগণের নিকট রসূলুল্লাহ্ সা.-এর সামগ্রিক জীবনার্দশই তাঁর 'সুন্নাহ্'।
২. উসূলবিদগণ রসূলুল্লাহ সা.-এর শরিয়া বা আইন ও বিধি বিধান সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে সুন্নাহ্ বলে আখ্যায়িত করেছেন।
৩. ফকীহগণ শরিয়তের করণীয় বিষয়গুলোর একটি স্তরকে সুন্নত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

---

৭. ড. মুস্তফা সিববায়ী : আস্ সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফি তাশরিয়ীল ইসলামি। চতুর্থ মুদ্রণ, দারুস্ সালাম, কায়রো ২০০৮ইসায়ী।
৮. তিরমিযি, আবু দাউদ : ইরবায ইবনে সারিয়া।

সুন্নত বা সুন্নাহ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী পারিভাষিক তিনটি সংজ্ঞাই সঠিক এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

০৭. মুহাদ্দিসগণের সংজ্ঞা অনুয়ায়ী সুন্নতের উদাহরণ

মুহাদ্দিসগণ মনে করেন আল্লাহ্র রসূলের সমগ্র জীবনাচরণ এবং জীবনাদর্শই তাঁর সুন্নত। সে হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত চাল চলন, কথাবার্তার বৈশিষ্ট্য, লেনদেনের বৈশিষ্ট্য, বিয়ে শাদীর বৈশিষ্ট্য, সামাজিক আচরণ, ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার কর্মকৌশল, রাষ্ট্র পরিচালনা, রাষ্ট্র পরিচালনার বৈশিষ্ট্য, ব্যবসা বানিজ্যের নিয়ম কানুন, অর্থনৈতিক বিষয়াদি, শিশুদের সাথে তাঁর আচরণ, স্ত্রীদের সাথে আচরণ, সহকর্মীদের সাথে আচরণ, শত্রুদের সাথে আচরণ, ইবাদত বন্দেগির বৈশিষ্ট্য ও নিয়ম কানুন এবং সামগ্রিক বিষয়াদিতে তাঁর প্রচলিত নিয়ম কানুন ইত্যাদির সবই তাঁর সুন্নাহ্।

উদাহরণ স্বরূপ, তিনি হাসি মুখে কথা বলতেন; তিনি নিচের দিকে তাকিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটতেন; তিনি কখনো কাউকেও গালি দেননি; তিনি নিজের ব্যক্তিগত বিষয়ে কারো থেকে প্রতিশোধ নেননি; তিনি ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন; তিনি বিয়ে শাদী করেছেন; তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেছেন; তিনি প্রতিদিন শতবার আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তিনি প্রতিদিন ফরয নামাযের আগে পরে বারো রাকায়াত নামায পড়তেন। তিনি বলেছেন: কর্মের প্রতিদান নির্ভর করবে নিয়্যতের উপর; স্থান ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা বিক্রেতার ক্রয় বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার আছে; সত্য মুক্তি দেয় এবং মিথ্যা ধ্বংস করে; সর্বোত্তম বাণী আল্লাহ্র কিতাব; বিছানা যার সন্তান তার; দেউলিয়া ঋণগ্রহীতাকে অবকাশ দাও; মুসলিমরা তাদের শর্তাবলীর সাথে আবদ্ধ। তাঁর সাথিরা তাঁর কোনো আদেশ ব্যাখ্যাগত কারণে একাধিক পদ্ধতিতে পালন করলে তিনি সবারটাই অনুমোদন করতেন। -এসবই তাঁর সুন্নত|

০৮. হাদিস ও সুন্নাহ্র সম্পর্ক

মুহাদ্দিসগণের সংজ্ঞা অনুযায়ী হাদিস ও সুন্নাহ্ খুবই কাছাকাছি। তাঁদের কেউ কেউ মনে করেন হাদিস এবং সুন্নাহ্ একই। তাঁরা মনে করেন একটি আরেকটির অপর নাম। তাঁদের কেউ কেউ মনে করেন একটির সাথে আরেকটির সম্পর্ক একেবারেই ঘনিষ্ঠ। কারো কারো মতে, হাদিসের মধ্যেই সুন্নত রয়েছে। যেমন, হাদিস শাস্ত্রের ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারি তাঁর সংকলিত শ্রেষ্ঠ হাদিস গ্রন্থ 'বুখারি শরিফ' বা 'সহীহ আল বুখারির' শিরোনাম দিয়েছেন:

اَلْجَامِعُ الصَّحِيْحُ الْمُسْنَدُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ اُمُوْرِ رَسُوْلِ الله ﷺ وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ

"রসূলুল্লাহ সা.-এর সামগ্রিক কার্যক্রমের, তাঁর সুন্নতসমূহের এবং তাঁর সময়কালের সনদযুক্ত সংক্ষিপ্ত সহীহ সংকলন।"

স্বীয় হাদিস সংকলনের শিরোনাম থেকে হাদিসের সংজ্ঞা সম্পর্কে ইমাম বুখারির দৃষ্টিভংগি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। এই শিরোনামটাই হাদিসের সংজ্ঞা।

-এ থেকে জানা যায়, হাদিস হলো, আল্লাহ্‌র রসূলের সামগ্রিক কার্যক্রম, তাঁর সুন্নাহ এবং তাঁর সময়কালের বিবরণের নাম।
-এ থেকে এটাও জানা যায় যে, সব হাদিসই সুন্নাহ্‌ নয়, তবে হাদিস, বা হাদিসের গ্রন্থ, বা হাদিসের সংকলনের মধ্যেই সুন্নাহ্‌ রয়েছে।

মূলত হাদিসের মধ্যেই সুন্নাহ্‌ রয়েছে আর এটাই হাদিস ও সুন্নাহ্‌র সম্পর্ক।

০৯. সুন্নতে রসূল, আদতে রসূল ও বিদ'আত

আমরা জেনেছি, আল্লাহ্‌র রসূল হিসেবে মুহাম্মদ সা.-এর সামগ্রিক জীবনাদর্শই তাঁর সুন্নাহ। তিনি আল্লাহ্‌র রসূল হিসেবে কুরআনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন, যা কিছু হিদায়াত দিয়েছেন, যে পন্থায় নিজে ইসলাম পালন করেছেন, ইবাদত বন্দেগী করেছেন, দীন বাস্তবায়ন করেছেন, যা কিছু হালাল এবং হারাম করেছেন এবং যা কিছু অনুমোদন ও সমর্থন করেছেন, সেগুলোই তাঁর সুন্নাহ্‌। সুন্নাহ্‌র অনুসরণেরই নির্দেশ কুরআনে দেয়া হয়েছে।

অপরদিকে তাঁর মধ্যে ছিলো একটি ব্যক্তিসত্ত্বা। একজন মানুষ হিসেবে অন্য সকল মানুষের মতোই তাঁর স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত অভ্যাস ছিলো, স্বভাব প্রকৃতি ছিলো। সকল মানুষের মতোই তিনি পানাহার করেছেন, পোশাক পরিধান করেছেন, হাঁটে বাজারে গিয়েছেন, মানুষের সাথে উঠাবসা করেছেন। এসব ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে ছিলো কিছু ভৌগলিক এলাকাগত অভ্যাস, সময়কালগত অভ্যাস, বংশগত অভ্যাস এবং রুচিগত স্বাতন্ত্র্য। এগুলো সুন্নত নয়, এগুলো ছিলো তাঁর ব্যক্তিগত আদত বা অভ্যাস। এগুলোর অনুসরণ উম্মতের জন্যে অপরিহার্য নয়। তবে তাঁকে ভালোবাসার কারণে তাঁর আদত বা অভ্যাসগুলো অনুসরণ করার মধ্যে দোষের কিছু নেই। বরং তাঁর প্রতি মহব্বতেরই লক্ষণ।

আমরা রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নতের পরিচয় পেলাম, তাঁর আদত বা অভ্যাসেরও পরিচয় পেলাম। এ দুটোর বাইরে রয়েছে আরেকটি জিনিস। সেটির নাম বিদ'আত। রসূল সা. দীন ও শরিয়তের মধ্যে এবং ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে তাঁর সুন্নাহ হিসেবে যা কিছু চালু ও প্রবর্তন করেছেন; দীন, শরিয়ত ও ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে তার বাইরে কোনো নিয়ম কানুন, প্রথা প্রচলন ও রীতি রেওয়াজ প্রচলন করার নামই বিদ'আত। রসূল সা.

বলেছেন: 'সকল বিদ'আতই গোমরাহি এবং সকল গোমরাহিই নিয়ে যায় জাহান্নামের দিকে।'

১০. কুরআনের অহি এবং হাদিসের অহি

কুরআন সরাসরি মহান আল্লাহ্‌র বাণী। সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই। কুরআন আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ অহি। অক্ষরে অক্ষরে তা আল্লাহ্‌র অহি। তার ভাষাও আল্লাহ্‌র এবং বক্তব্যও আল্লাহ্‌র।

আর হাদিস? হ্যাঁ, হাদিসও নিঃসন্দেহে অহি। তবে কুরআনের অহির মতো নয়। এই দুই ধরণের অহির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

কুরআনের অহি পুরোটাই আল্লাহ তা'আলা জিবরিল আমীনের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। তিনি অক্ষরে অক্ষরে তা নবী করিম সা.-কে শুনিয়েছেন। নবী করিম সা. তা অক্ষরে অক্ষরে মুখস্ত করে নিয়েছেন। কুরআনকে হুবহু ধারণ করবার জন্যে মহান আল্লাহ্‌ তাঁর রসূলের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং তাঁর হৃদয়ে কুরআনকে খোদাই করে দিয়েছেন। জিব্রীলের কাছ থেকে শুনবার পর তিনি তা সাহাবিদের শুনাতেন এবং লিপিবদ্ধ করে নিতেন। সাহাবিরাও সাথে সাথে মুখস্ত করে নিতেন। এ অহির একটি অক্ষরও পরিবর্তন করার অধিকার নবীর ছিলোনা। এ অহিই নামাযে তিলাওয়াত করতে হয়। এ অহিকেই বলা হয় 'অহিয়ে মাতলু।'

হাদিসের অহির ধরণ এর চাইতে ভিন্নতর। হাদিসের অহি শুধু কেবল জিব্রীলের মাধ্যমেই আসেনি। বরং সেই সাথে স্বপ্ন, ইলকা, ইলহাম অর্থাৎ ইংগিত প্রাপ্তি ও মনের মধ্যে অনুভুতি সৃষ্টির মাধ্যমেও লাভ করতেন। আসলে এ পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু অহি করা হতো, ভাষা নয়। তিনি ভাব লাভ করতেন আর এ ভাবটিকে তিনি নিজের ভাষায় ব্যক্ত করতেন। এ অধিকার তাঁকে দেয়া হয়েছিল। এরূপ অহিকে 'অহিয়ে গায়রে মাতলু' বলা হয়। অবশ্য কুরআনের আলোকে রসূলের ইজতিহাদও হাদিস।

'মাতলু' মানে যা রসূলকে পাঠ করে শুনানো হয়েছে এবং তিনিও হুবহু পাঠ করতে বাধ্য ছিলেন। আর 'গায়রে মাতলু' মানে-যা পাঠ করে শুনানো হয়নি এবং তিনি হুবহু পাঠ করে শুনাতে বাধ্য ছিলেন না।

১১. কুরআন ও হাদিসের মধ্যে পার্থক্য

হাদিস যদিও রসূলুল্লাহ সা. অহির মাধ্যমে লাভ করেছেন, তবু হাদিস কুরআন বা কুরআনের অহির সমতুল্য নয়। কুরআন এবং হাদিসের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্যসমূহ বিদ্যমান:

০১. অক্ষরে অক্ষরে কুরআনের ভাষা এবং বক্তব্য দুটোই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। পক্ষান্তরে হাদিসের বক্তব্য বা বিষয়বস্তুই কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে লাভ করেছেন, আর ভাষা দিয়েছেন রসূল সা. নিজে।

০২. কুরআন কেবলমাত্র জিবরিল আমিনের মাধ্যমে নাযিল হয়েছে। অথচ হাদিস ইলহাম এবং স্বপ্নযোগেও রসূল সা. লাভ করেছেন।

০৩. কুরআন উম্মুল কিতাবে লওহে মাহফুয বা সুরক্ষিত ফলকে সংরক্ষিত। সেখান থেকেই নাযিল হয়েছে। কিন্তু হাদিস লওহে মাহফুযে সংরক্ষিত নয়।
০৪. কুরআন পাঠ করা ইবাদত। প্রতিটি অক্ষর তিলাওয়াত করার জন্যে দশটি সওয়াব পওয়া যায়। হাদিস তিলাওয়াত ইবাদত নয়।
০৫. কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া নামায হয়না, কিন্তু হাদিসের অবস্থা তা নয়।
০৬. কুরআন রসূলের উপর অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র এক আশ্চর্য মু'জিযা। এর মতো বাণী তৈরি করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু হাদিসের অবস্থা তা নয়।
০৭. কুরআন সরাসরি আল্লাহ্‌র ভাষা ও বক্তব্য। কিন্তু হাদিস মানুষের (নবীর) তৈরি ভাষা ও কথা।
০৮. কুরআন অমান্যকারী কাফির হয়ে যায়। কিন্তু বিশেষ যুক্তিতে কেউ কোনো হাদিস অমান্য করলে তাকে কাফির বলা যায়না।
০৯. কুরআন সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আল্লাহ নিজে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হাদিস কেবল মানুষের বর্ণনার ভিত্তিতেই সংরক্ষিত।

১২. হাদিসের সনদ ও মতন

হাদিস শিক্ষাদানকারী, বর্ণনাকারী ও সংকলনকারী রসূলুল্লাহ্ সা. থেকে আরম্ভ করে তাঁর পর্যন্ত বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিক নাম উল্লেখপূর্বক প্রতিটি হাদিস বর্ণনা বা লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং প্রতিটি হাদিস দুইভাগে বিভক্ত:

১. বর্ণনাকারীদের নামের ধারাবাহিক তালিকা। এটাকে হাদিসের পরিভাষায় 'সনদ' (সূত্র) বলা হয়।

২. দ্বিতীয় হাদিস অংশ। এ অংশের পারিভাষিক নাম 'মতন' (মূল বক্তব্য)।

১৩. হাদিস কিভাবে সংরক্ষিত হয়েছে?

রসূলে করিম সা.-এর গোটা হাদিস ভান্ডার তিনটি নির্ভরযোগ্য পন্থায় হিফাযত ও সংরক্ষিত হয়ে আসছে:

১. উম্মতের আমল ও বাস্তব অনুসরণের মাধ্যমে।
২. লেখা, মুখস্তকরণ ও গ্রন্থাবদ্ধ করণের মাধ্যমে।
৩. শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে।

এই তিনটি পন্থায় রসূলে করিমের সমস্ত হাদিস হিফাযত ও সংরক্ষিত হয়েছে। সমস্ত হাদিস সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়ে যাওয়ার পর বর্ণনা, বর্ণনাকারী ও বিষয়বস্তুর ব্যাপক পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রকৃত হাদিসের সংগে যেসব ভুল তথ্য ও মনগড়া কথা ঢুকে পড়েছিল সেগুলোকে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে।

১৪. হাদিসের শ্রেণী বিভাগ

মুহদ্দিসগণ হাদিসকে নিম্নরূপ শ্রেণী বিভাগে ভাগ করেছেন:

১. কর্মের ধরণগত শ্রেণী বিভাগ।
২. সনদ ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ।
৩. বর্ণনাকারীদের অবস্থা ও সংখ্যা ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ।
৪. শুদ্ধতা অশুদ্ধতা ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ।

১. কর্মের ধরণগত শ্রেণী বিভাগঃ প্রথমত রসূল সা.-এর কর্মের ধরণের ভিত্তিতে অর্থাৎ তাঁর কথা, কাজ ও অনুমোদন-এর ভিত্তিতে হাদিসকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলো হলো:

কথা বা বাণীগত হাদিস: কোনো সাহাবী যখন 'রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন' বা 'রসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি'। বলে হাদিস বর্ণনা করেন, তখন সে হাদিসকে কথা বা বাণীগত (قَوْلِيْ) হাদিস বলা হয়।

কর্ম বা আচরণগত হাদিস: কোনো সাহাবী যখন 'আমি রসূলুল্লাহ সা. কে এরূপ করতে দেখেছি' বলে হাদিস বর্ণনা করেন, তখন সে হাদিসকে কর্মগত বা আমলি হাদিস বলা হয়।

অনুমোদনগত হাদিস: কোনো সাহাবী যখন বলেন: 'আমি বা আমরা অমুক কাজ করেছি, রসূলুল্লাহ সা. তা দেখে কিংবা শুনার পর চুপ ছিলেন, কিংবা এমন কাজ করতে আমাদের নিষেধ করেননি' -এরূপ হাদিসকে অনুমোদনগত বা সমর্থনগত (تَقْرِيْرِى) হাদিস বলা হয়।

২. হাদিসের সনদ ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগঃ সনদের অক্ষুন্ন ধারাবাহিকতা, সনদ কর্তিত হওয়া এবং সনদ উহ্য থাকার ভিত্তিতে হাদিস আট প্রকার। সেগুলো হলো:

১. মারফু হাদিস: যে হাদিসের বর্ণনাসূত্র (সনদ) রসূলুল্লাহ্ সা. পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মারফূ' হাদিস বলা হয়।
২. মওকূফ হাদিস: যে হাদিসের বর্ণনা সূত্র (সনদ) সাহাবী পর্যন্ত এসে স্থগিত হয়ে গেছে তাকে মওকূফ হাদিস বলা হয়।
৩. মাকতূ: যে হাদিসের সনদ তাবেয়ী পর্যন্ত এসে স্থগিত হয়ে গেছে তাকে মাকতূ' হাদিস বলা হয়।
৪. মুত্তাসিল হাদিস: উপর থেকে নিচ পর্যন্ত যে হাদিসের সনদ বা বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন থেকেছে এবং কোনো পর্যায়ে কোনো বর্ণনাকারী উহ্য থাকেনি এরূপ হাদিসকে মুত্তাসিল হাদিস বলা হয়।
৫. মুনকাতি' হাদিস: যে হাদিসে বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা অক্ষন্ন না থেকে মাঝখান থেকে কোনো বর্ণনাকারীর নাম উহ্য বা লুপ্ত রয়ে গেছে তাকে মুনকাতি' হাদিস বলা হয়।
৬. মুয়াল্লাক হাদিস: যে হাদিসের গোটা সনদ বা প্রথম দিকের সনদ উহ্য থাকে তাকে মুয়াল্লাক হাদিস বলা হয়।

৭. মুদাল হাদিস: যে হাদিসে ধারাবাহিকভাবে দুই বা ততোর্ধ্ব বর্ণনাকারী উহ্য থাকে তাকে মুদাল হাদিস বলা হয়।

৮. মুরসাল হাদিস: যে হাদিসের সনদে তাবেয়ী এবং রসূল সা.-এর মাঝখানে সাহাবি বর্ণনাকারীর নাম উহ্য থাকে তাকে মুরসাল হাদিস বলে।

৩. বর্ণনাকারীদের সংখ্যা ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ: বর্ণনাকারীদের সংখ্যার ভিত্তিতে হাদিস প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত:

১. মুতাওয়াতির: সেসব হাদিসকে মুতাওয়াতির হাদিস বলা হয়, প্রতিটি যুগেই যে সব হাদিসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা ছিলো এতো অধিক যাদের মিথ্যাচারে মতৈক্য হওয়া স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভব।

২. খবরে ওয়াহিদ: সেসব হাদিসকে খবরে ওয়াহিদ বলা হয়, যেগুলোর বর্ণনাকারীদের সংখ্যা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছায়নি। হাদিস বিশারদগণ এরূপ হাদিসকে তিনভাগে ভাগ করেছেন:

   ১. মশহুর: বর্ণনাকারী সাহাবীর পরে কোনো যুগে যে হাদিসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা তিনের কম ছিলোনা।

   ২. আযীয: যে হাদিসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোনো যুগেই বা বর্ণনার কোনো স্তরেই দুই-এর কম ছিলোনা।

   ৩. গরীব: যে হাদিসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোনো কোনো স্তরে বা যুগে একজনে এসে পৌঁছেছে।

৪. শুদ্ধতা ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ: বর্ণনাকারীদের অবস্থা, সনদের ধারাবাহিকতা এবং মতনের ধরণের ভিত্তিতে হাদিসকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। বিভক্তিগুলো হলো:

১. **সহীহ হাদিস:** সেই হাদিসকে সহীহ (বিশুদ্ধ ও নির্ভুল) হাদিস বলা হয় যাতে নিম্নোক্ত শর্তগুলো বর্তমান থাকে:

   ক. যার মতন বা বিষয়বস্তু কুরআন, রসূলুল্লাহ্ সা.-এর সামগ্রিক আদর্শ এবং বিপুল সংখ্যক সহীহ হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

   খ. যার সনদের সকল স্তরের সকল বর্ণনাকারী সিকাহ অর্থাৎ বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ণ এবং আল্লাহভীরু।

   গ. যার সনদের সকল বর্ণনাকারী প্রখর ও স্বচ্ছ স্মরণশক্তির অধিকারী।

   ঘ. যার সনদ মুত্তাসিল।

   ঙ. যা শায নয়। শায হলো সেই হাদিস যার বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত বটে, তবে তার চাইতে অধিক বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর বর্ণনার বিপরীত।

চ. যা মুয়াল্লাল নয়। মুয়াল্লাল হলো সেই হাদিস যার সনদে এমন সুক্ষ্ম ত্রুটি থাকে যা কেবল হাদিস বিশারদগণই পরখ করতে পারেন।

২. **হাসান হাদিস:** সেই হাদিসকে হাসান (উত্তম) হাদিস বলা হয়, যার মধ্যে সহীহ হাদিসের সকল শর্তই বর্তমান আছে, তবে শুধু কেবল সনদের এক বা একাধিক বর্ণনাকারীর স্মরণ শক্তিতে কিছুটা দুর্বলতা আছে।

৩. **যয়ীফ হাদিস:** ইমাম নববী বলেছেন, যে হাদিসে সহীহ এবং হাসান হাদিসের শর্তাবলী বর্তমান পাওয়া যায়না, তাই যয়ীফ হাদিস।[৯]

১৫. হাদিস ও সুন্নাহ্ ইসলামি শরিয়ার দ্বিতীয় উৎস

রসূলুল্লাহ্র হাদিস ভান্ডারের মধ্যেই সন্নিবেশিত রয়েছে তাঁর সুন্নাহ্। হাদিস থেকেই জানা যায় সুন্নতে রসূল। মহানবী সা. তো স্পষ্টই বলে গেছেন যে, কুরআন এবং সুন্নতে রসূল আঁকড়ে ধরতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা রসূলকে একথাও জানিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন যে:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ •

অর্থ: (হে নবী!) বলে দাও, তোমরা যদি সত্যি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলেই আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।[১০]

রসূলের অনুসরণ করতে হলে রসূলের দিয়ে যাওয়া কুরআনকে গ্রহণ করার সাথে সাথে তাঁর সুন্নাহ্কেও গ্রহণ করতে হবে। কারণ সুন্নাহ্ বা হাদিস তো কুরআনেরই ব্যাখ্যা:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ •

অর্থ: আমি তোমার কাছে আয্ যিক্র (কুরআন) নাযিল করেছি, যেনো তুমি তাদের প্রতি যা নাযিল করা হলো, তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।[১১]

তাছাড়া কুরআনের বিভিন্ন স্থানে স্পষ্ট করেই বলে দেয়া হয়েছে যে:

أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ . فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ •

অর্থ: আল্লাহ্র আনুগত্য করো আর রসূলের, যদি এ আনুগত্য পরিহার করো, তবে যেনে রাখো আল্লাহ কাফিরদের পছন্দ করেন না।[১২]

আসলে রসূলের কোনো ফায়সালা অমান্য করবার কোনো অধিকারই কোনো মুমিনের নেই:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا •

৯. ইমাম নববী : সহীহ মুসলিম-এর ভূমিকা।
১০. আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩১।
১১. আল কুরআন, সূরা আন নহল : আয়াত ৪৪।
১২. আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩২।

অর্থ: আল্লাহ এবং তাঁর রসূল যখন কোনো বিষয়ে ফায়সালা প্রদান করেন, তখন আর সে বিষয়ে ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর নেই। আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ফায়সালা অমান্য করবে সে সুস্পষ্টভাবে বিপথগামী হবে।[১৩]

রসূলের ফায়সালা অমান্য করা যাবেনা ব্যাপার কেবল এতোটুকুই নয়, বরং রসূলকেই ফায়সালাকারী মানতে হবে:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا •

অর্থ: তোমার প্রভুর শপথ, তারা কখনো মুমিন হতে পারবেনা যতোক্ষণ না তারা তাদের বিরোধ বিবাদে তোমাকে সালিশ মানবে। শুধু তাই নয়, তুমি যে ফায়সালা দেবে তাও নিঃসংকোচে গ্রহণ করবে এবং প্রশান্ত মনে মেনে নেবে।[১৪]

ব্যস্, রসূলের আনুগত্য করা, তাঁর সিদ্ধান্ত ও ফায়সালা গ্রহণ করা এবং রসূলের ইত্তেবা ও অনুসরণ করার অপরিহার্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো। কিন্তু কিভাবে? রসূলকে মানা এবং তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করার পথ কি? এর একমাত্র পথই হলো কুরআনের সাথে সাথে হাদিস পড়তে হবে এবং হাদিসের আলোকে সুন্নতে রসূলকে জানতে হবে, মানতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে।

একজন মুসলিমের যেমন কুরআন মানতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে, তেমনি কুরআনের সাথে সাথে তাকে সত্যিকার মুসলিম হবার জন্যে হাদিস জানতে হবে এবং মানতে হবে।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম বলেছেন, সুন্নাতে রসূল হলো:

০১. কুরআনে যা আছে তাই, কিংবা
০২. কুরআনেরই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, অথবা
০৩. কুরআনে নেই, অথচ মুমিনদের কর্তব্য এমন জিনিস।

এ কারণেই ইসলামী শরিয়ার উৎস হিসেবে হাদিস বা সুন্নতে রসূলকে অবশ্যি গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ্র ঘোষণা:

مَنْ يُّطِيْعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ

অর্থ: যে রসূলের আনুগত্য করলো, সে মূলত আল্লাহ্রই আনুগত্য করলো।[১৫]

---

১৩. আল কুরআন, সূরা ৩৩ আহযাব : আয়াত ৩৬।
১৪. আল কুরআন, সূরা আন নিসা : আয়াত ৬৫।
১৫. আল কুরআন, সূরা আন নিসা : আয়াত ৬৯।

তাই রসূল সা. প্রদত্ত কুরআন হাদিস উভয়টাকেই সমানভাবে দীন ও শরিয়ার উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا •

অর্থ: 'রসূল তোমাদের যা দিয়েছেন তোমরা তা গ্রহণ করো। আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেছেন, তা তোমরা পরিত্যাগ করো।'[১৬]

হাদিস ও সুন্নতের গুরুত্ব সম্পর্কে স্বয়ং নবী করিম সা. বলেছেন:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ •

অর্থ: আমি তোমাদের জন্যে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতোদিন তোমরা এদুটোকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, ততোদিন কিছুতেই বিপথগামী হবেনা। সেগুলো হলো: ১. আল্লাহ্‌র কিতাব এবং ২. তাঁর রসূলের সুন্নাহ্‌।[১৭]

১৬. হাদিস ছাড়া ইসলাম পালন করাই সম্ভব নয়

হাদিস ছাড়া কুরআনের ব্যাখ্যা জানা সম্ভব নয়। রসূল সা. কুরআনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাঁর ব্যাখ্যাই কুরআনের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা। তাঁর সাথে সাংঘর্ষিক কোনো ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

ইসলামের সকল বিধান পালনের ক্ষেত্রে এবং সব ধরণের আনুষ্ঠানিক ইবাদত বন্দেগি পালনের ক্ষেত্রে হাদিস ছাড়া সেগুলো পালন করা সম্ভব নয়। যেমন নামায। কেউ কি হাদিস ছাড়া শুধুমাত্র কুরআন দ্বারা নামায পড়তে পারবে? না, কিছুতেই পারবেনা।

কুরআন মজিদে বলা হয়েছে: নামায কায়েম করো, রুকু করো, সাজদা করো, যতোটা সহজ হয় কুরআন পাঠ করো। কিন্তু এতোটুকুতেই কি নামায আদায় করা সম্ভব? না, বরং নামায পড়তে হলে হাদিস অনুসরণ করতে হবে। হাদিসেই বলে দেয়া হয়েছে নামাযের নিয়ম পদ্ধতি:

তকবির বলে শুরু করা, প্রথম তকবিরের পর ছানা পড়া, দোয়া করা, সূরা ফাতেহা পড়া, সূরা ফাতেহা পাঠের পর আমিন বলা, সূরা ফাতিহার সাথে কুরআনের অন্য কোনো অংশ মিলানো, তকবির বলে হাতে হাঁটু ধরে পিঠ সোজা করে রুকুতে যাওয়া, রুকুতে তসবিহ পড়া, রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, দাড়াবার সময় সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ বলা, তাকবির বলে সাজদায় যাওয়া, সাজদায় তসবিহ ও দোয়া পাঠ করা, দুই সাজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা, দোয়া করা, দুই রাকাত পড়ার পর বসে

---

১৬. আল কুরআন, সূরা হাশর : আয়াত ৭।
১৭. হাদিস গ্রন্থ : মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক, মিশকাত, কানযুল উম্মাল।

আত্তাহিয়্যাতু পড়া, শেষ রাকাতে বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়া, দরূদ পাঠ করা, সালাম বলে নামায শেষ করা। ফজর নামায দুই রাকাত, যোহর চার রাকাত, আছর চার রাকাত, মাগরিব তিন রাকাত, ইশা চার রাকাত, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আগে পরে বারো রাকাত সুন্নত পড়া, বিতির নামায পড়া, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সূচনা এবং শেষ সময়, নামাযের ওয়াক্তের সূচনায় আযান দেয়া, আযানের ভাষা, নামাযে দাঁড়ানোর পদ্ধতি, রুকুর পদ্ধতি, সাজদার পদ্ধতি, বসার পদ্ধতি ইত্যাদি সবই জানা যায় হাদিস থেকে। এ বিষয়গুলো কুরআনে বলে দেয়া হয়নি। তাই হাদিস ছাড়া কোনো অবস্থাতেই নামায পড়া সম্ভব নয়।

যেমন যাকাত। হাদিস ছাড়া যাকাত আদায় করা সম্ভব নয়। কুরআনে বলা হয়েছে 'যাকাত প্রদান করো'। আর কাদেরকে যাকাত দিতে হবে সেটা বলা হয়েছে।

কিন্তু কি কি ধরণের সম্পদ কী কী পরিমাণ থাকলে কোন্‌টির কী হারে যাকাত দিতে হবে, কী পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত দেয়া লাগবেনা - এসবই জানা যায় হাদিস থেকে।

একইভাবে হজ্জ ও রোযার নিয়ম কানুন জানতে হবে হাদিস থেকে।

ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়ম কানুন, উপার্জন নীতি, সামাজিক আচরণ, পারিবারিক আচরণ, দায়িত্ব কর্তব্য, ভূমি ব্যবস্থা, রাষ্ট্রনীতি, সমরনীতি, প্রতিবেশীদের সাথে আচরণ, এই সবই জানতে হবে হাদিস থেকে। কারণ কুরআনে তো কেবল মৌলিক নির্দেশ আর মূলনীতিই দেয়া হয়েছে।

অনেকে ভ্রান্ত ধারণা বা অজ্ঞতা বশত বলে থাকে, সব ফরয বিষয় কুরআনেই বলে দেয়া হয়েছে, সুতরাং হাদিসের প্রয়োজন কী?

আমরা বলবো, ফরয নির্দেশগুলো শুধু কুরআনে নয়, কুরআন হাদিস দুটোতেই দেয়া হয়েছে। দেখুন, নামায পড়া যেমন ফরয, তেমনি ফজর দুই রাকাত পড়া, যুহর চার রাকাত, আছর চার রাকাত, মাগরিব তিন রাকাত এবং ইশা চার রাকাত পড়া ফরয।

নামায পড়া ফরয সেকথা আমরা কুরআন থেকে জানতে পারলেও কোন্ নামায কতো রাকাত পড়া ফরয তা কেবল হাদিস থেকেই জানা যায়। সুতরাং হাদিস বাদ দিয়ে কিভাবে ফরয আদায় করবেন?

১৭. মওদু বা মনগড়া জাল হাদিস

মওদু (مَوْضُوْعٌ) মানে- মনগড়া, বানানো, স্বরচিত, জাল। জাল, মনগড়া, বানানো ও লোকদের রচিত কথা মূলত হাদিস নয়; হাদিসের কোনো স্তরের সাথেই সংযুক্ত নয়। বিভিন্ন সময় কিছু কিছু লোক প্রচলিত এবং মনগড়া কথার সাথে সনদ যুক্ত করে তা হাদিস হিসেবে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে।

'মনগড়া হাদিস' কারা এবং কেন রচনা করেছে? মুহাদ্দিসগণের বিশ্লেষণে এ ব্যাপারে যা বেরিয়ে এসেছে তা হলো:

১. রাজনৈতিক কারণে ও শাসকদের তোষণে হাদিস রচনা করা হয়েছে।
২. শিয়াদের বিভিন্ন গ্রুপ নিজেদের মতের পক্ষে হাদিস রচনা করেছে।
৩. খারেজিরা নিজেদের মতের পক্ষে হাদিস রচনা করেছে।
৪. যিন্দিক বা ধর্মের ভানকারীরা হাদিস রচনা করেছে।
৫. গোত্র, ভাষা, জাতি, দেশ ও নেতা প্রীতি নিয়ে হাদিস রচনা করা হয়েছে।
৬. কাহিনীকার এবং এক শ্রেণীর ওয়ায়েযরা হাদিস রচনা করেছে।
৭. মু'তাযিলা সহ বিভিন্ন আকিদা বিশ্বাসপন্থীরা তাদের মতবাদের পক্ষে হাদিস রচনা করেছে।
৮. কিছু কিছু সুফী মানুষকে ইবাদত বন্দেগিতে মশগুল করার জন্যে ফযিলত ও ভক্তিমূলক হাদিস রচনা করেছে।

এ ধরণের রচনাকারীরা সকলেই বিশেষজ্ঞগণের হাদিস যাচাইর জন্যে তৈরি করা জাল এবং চিরুনীতে ধরা পড়ে গেছে। তারা যা কিছু রচনা করেছে সেগুলোও চিহ্নিত করা হয়েছে। আলাদাভাবে জাল হাদিসের সংকলন করে তাদের চেহারাও উম্মোচন করা হয়েছে।

১৮. হাদিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ

একদিকে হাদিস ভান্ডারে জাল হাদিস ঢোকানোর চেষ্টা করা হয়েছে, অপরদিকে সেই প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন শ্রেণীর হাদিস অস্বীকারকারী লোকদের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। হাদিস অস্বীকারকারীদের মূল উদ্দেশ্য: ইসলাম নামক ঘরের দরজা, জানালা, বিদ্যুত সংযোগ, পানি সংযোগ, গ্যাস সংযোগ, নিষ্কাশন ব্যবস্থা, কারুকার্য, ছাদ এবং দেয়াল খুলে ফেলে ইসলামকে ঠুটো জগন্নাথে পরিণত করা।

এ জন্যে তারা হাদিসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ - আপত্তি উত্থাপন করে আসছে। তাদের অভিযোগ সমূহ মোটামুটি এরকম:

০১. কুরআনেই সব কিছু বলে দেয়া আছে, তাই হাদিসের প্রয়োজন নেই।
০২. কুরআন স্বয়ং সম্পূর্ণ। হাদিস গ্রহণ করলে কুরআনের অপূর্ণাঙ্গতা বুঝায়।
০৩. হাদিসকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা যায়না।
০৪. হাদিস রসূলের সময় লিখে রাখা হয়নি। দেড় দুইশ বছর পরে লেখা হয়েছে। তাই সবই ভেজাল।
০৫. মানুষের অভিজ্ঞতায় যেসব বিষয় ধরা পড়েনি সেসবই হাদিস হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।
০৬. যা বিবেক বুদ্ধি গ্রহণ করেনা -তা হাদিস হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।
০৭. হদিস হলো, মানুষের খামখেয়ালীতে তৈরি কিছু বিশৃংখল রীতি প্রথা।
০৮. সহীহ হাদিস মানে নির্ভুল হাদিস নয়।
০৯. কুরআনে যা নেই সে সম্পর্কে হাদিসের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

১০. হাদিস যাচাইর অতীতের মানদন্ড সমূহ সঠিক নয়, নতুন করে মানদন্ড ঠিক করে হাদিস যাচাই করতে হবে।

এসব অভিযোগ হাদিস সম্পর্কে সেইসব লোকেরাই করে আসছে-

০১. যারা মুহাদ্দিস বা হাদিস বিশেষজ্ঞ নয়,
০২. যারা মতলববাজি নিয়ে ইসলামে প্রবেশ করেছে,
০৩. যারা নিজেরা কোনো মতবাদ তৈরি করে নিয়েছে,
০৪. যারা নিজেদের মতবাদ ইসলামের উপর চাপিয়ে দিতে চায়,
০৫. যারা মুসলিম হয়েও ভিন্ন মতবাদে প্রভাবিত,
০৬. যারা ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায়, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী।
০৭. যারা ইহুদি সম্প্রদায়,
০৮. ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলিম,
০৯. কাদিয়ানী সম্প্রদায়,
১০. ধর্মের ভানকারী সম্প্রদায়।

এই লোকেরা সাধারণত যুক্তিবাদী হয়ে থাকে। তাদের যুক্তিতে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ কিছু লোক সব সময়ই প্রভাবিত হয়েছে। এ ধরণের লোকেরা সাহাবীগণের সময়ও ছিলো। এখনো আছে। হিমালয়ান উপমহাদেশে বিভিন্ন নামে এদের অবস্থান রয়েছে। আধুনিক কালে রাশাদ খলিফা নামে ইসলামের ছদ্মবেশধারী জনৈক নাস্তিক এবং তাঁর অনুসারীরাও ওয়েব সাইটের মাধ্যমে তার ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করে আসছে। মু'তাযিলারাও বিভিন্ন ছদ্মাবরণে হাদিস বিরোধিতার কাজ করছে।

স্বয়ং আল কুরআন, গোটা হাদিস শাস্ত্র, হাদিস সংকলনের ইতিহাস গ্রন্থ সমূহ, উসূলে হাদিসের গ্রন্থ সমূহে এদের সকল কুযুক্তির জবাব রয়েছে।

১৯. হাদিস সংরক্ষণ এবং দুর্বল ও জাল হাদিস চিহ্নিত করণ

রসূলুল্লাহ সা. তাঁর জীবদ্দশায় কুরআন নাযিলকালে তাঁর হাদিস লিপিবদ্ধ করতে নিরুৎসাহিত করেছেন। কারণ তখন কুরআনও লিপিবদ্ধ করা হচ্ছিল। কুরআনের পাশাপাশি হাদিসও লিপিবদ্ধ হোক -এটা তিনি পছন্দ করেননি। তবে কাউকে কাউকেও অনুমতি দিয়েছেন।

তিনি তাঁর হাদিস মুখস্ত করে স্মৃতি শক্তিতে ধারণ করে রাখার জন্যে তাঁর সাহবীগণকে উৎসাহিত করেছেন এবং এ কাজে তাদের জন্যে দোয়াও করেছেন।

সাহাবীগণ আল্লাহ্‌র রসূলের হাদিস স্মৃতিতে ধারণ করেছেন এবং কোনো কোনো সাহাবী নিজের জানা হাদিসগুলো লিখেও রেখেছেন। সেই সাথে তাঁরা তাদের পরবর্তী প্রজন্ম অর্থাৎ তাবেয়ীদের কাছে হাদিস-এর আমানত স্থানান্তরিত করেছেন।

তাবেয়ীগণ আল্লাহ্‌র রসূলের হাদিস-

১. সাহাবীগণের নিকট থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন,
২. মুখস্ত করেছেন,
৩. লিপিবদ্ধ করেছেন,
৪. হাদিস শিক্ষা কেন্দ্র খুলেছেন,
৫. শিক্ষা দান করেছেন।

অতপর আসে তাঁদের পরবর্তী যুগ অর্থাৎ তাবে তাবেয়ীগণের যুগ এবং তাঁদের পরবর্তী লোকদের যুগ। এসময় ব্যাপকভাবে-

১. গড়ে উঠে হাদিসের কেন্দ্র,
২. লোকেরা হাদিস শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং মুখস্ত করেন।
৩. হাদিস লিখে রাখেন,
৪. হাদিস সংকলন করেন,
৫. হাদিস শিক্ষাদান করেন,
৬. হাদিসের হিফাযত করেন।

এ কয়েকটি পর্যায় অতিক্রমকালে হাদিসের ভান্ডারে ঢুকে পড়ে-

১. কিছু জয়ীফ (দুর্বল) হাদিস,
২. ত্রুটিপূর্ণ ও অগ্রহণযোগ্য হাদিস এবং
৩. মওদু অর্থাৎ মনগড়া- জাল হাদিস।

ফলে তাবেয়ীগণ এবং তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের হাদিস বিশেষজ্ঞগণ হাদিস যাচাই বাছাই করেন। তাঁরা বিশুদ্ধ- নির্ভুল হাদিস থেকে চিহ্নিত ও আলাদা করেন জয়ীফ, অগ্রহণযোগ্য এবং জাল হাদিস সমূহ।

আলহামদুলিল্লাহ হাদিস নির্ভুল প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত রয়েছে। মুহাদ্দিসগণ এ বিষয়টির প্রতি এতোই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, পৃথিবীর অন্য কোনো জ্ঞানভান্ডার নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ করার জন্যে মানুষ এতোটা সতর্কতা, বিচার বিশ্লেষণ ও কঠোর সাধনা করেনি। তাঁদের গৃহীত ব্যবস্থা সমূহের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক হলো:

১. হাদিস বর্ণনাকারীদের সামগ্রিক চরিত্র বিশ্লেষণ করে সত্যবাদী, বিশ্বস্ত, প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী এবং আল্লাহভীরু লোকদের বর্ণনাই গ্রহণ করা হয়েছে।
২. বর্ণনাকারীদের পরিচয় ও চরিত্র বিশ্লেষণ করে একটি অপূর্ব শাস্ত্রের জন্ম দেয়া হয়েছে- তার নাম রিজাল শাস্ত্র।
৩. হাদিসের শুদ্ধাশুদ্ধ, ভুল নির্ভুল এবং জাল আসল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীদের চরিত্রকেও একটি ভিত্তি বানানো হয়েছে।
৪. বর্ণনাকারীদের পরিচয় তালিকা উল্লেখ বিহীন কোনো হাদিস গ্রহণ করা হয়নি।

৫. হাদিসের মূল বক্তব্য (মতন) কঠোরভাবে বিশ্লেষণ এবং এক্সামিন ও ক্রস এক্সামিন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্র সেইসব হাদিসকে বাতিল করা হয়েছে:

ক. যেগুলোর বক্তব্য কুরআনের সাথে, কুরআনের স্পীরিটের সাথে সাংঘর্ষিক।
খ. যে হাদিসের বক্তব্য অনেকগুলো সহী হাদিসের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক।
গ. যে হাদিসের বক্তব্য রসূল সা.-এর সামগ্রিক জীবনাদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক।
ঘ. যে হাদিসে কোনো প্রকার বিদ্বেষ ছড়ানো হয়েছে।

যেসব হাদিস যাচাই-বাছাইর মূলনীতির আলোকে সহীহ, সেগুলো সাধারণ বিবেক বুদ্ধি, বাস্তবতা এবং প্রকৃতির সাথে কোনো ভাবেই সাংঘর্ষিক নয়।

২০. হাদিস সংরক্ষণের সোনালি ইতিহাস[১৮]

গোটা হাদিস ভান্ডারের সংরক্ষণ, সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে পেশ করা হচ্ছে। এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সহজেই বুঝা যাবে রসূলে করিম সা.-এর বিরাট হাদিস ভান্ডার বিগত তের চৌদ্দশ শতাব্দী যাবত কোন্ কোন্ অবস্থা ও অধ্যায় অতিক্রম করে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে? এ চিত্র থেকে সেসব মহান পূতাত্মা মনিষীদের পরিচয়ও পাওয়া যাবে যাঁরা হিকমত ও হিদায়াতের এ অমূল্য ভান্ডার ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে বিশুদ্ধ পন্থায় গ্রন্থাকারে সুরক্ষিত ও সংকলিত করে যাবার জন্যে নিজেদের জীবনকে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন এবং প্রয়োজনে এ পথে নিজেদের জীবন বাজি রাখতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

আগেই বলেছি, তিনটি নির্ভরযোগ্য পন্থা ও মাধ্যমে রসূলে করিমের হাদিস সমূহ আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। অর্থাৎ:

১. উম্মতের আমল ও বাস্তব অনুসরণের মাধ্যমে।
২. লিখনী, মুখস্ত করণ ও গ্রন্থাবদ্ধ করণের মাধ্যমে।
৩. মুখস্ত বর্ণনা তথা শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে।

এপর্যায়ে হাদিস সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও শিক্ষকগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অধ্যায় ভিত্তিক আলোকপাত করবো। এ অধ্যায়ের সংকলন ও মুখস্তকারীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ:

ক. প্রথম অধ্যায়: রসূল সা. এর যামানা থেকে হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এ অধ্যায় বিস্তৃত। এ যুগের হাদিস সংগ্রাহক, সংকলক ও সংরক্ষণকারীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ:

১. আবু হুরায়রা রা. (আবদুর রহমান): মৃত্যু ৫৯হি. বয়স ৭৮ বছর, হাদিস বর্ণনার সংখ্যা ৫৩৭৪। তাঁর নিকট থেকে হাদিস শিক্ষা গ্রহণকারীগণের সংখ্যা ৮০০ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

---

১৮. এ অনুচ্ছেদটি লেখা হয়েছে মদিনা ইসলামি ইউনিভার্সিটির সাবেক হাদিসের প্রফেসর আবদুল গাফ্‌ফার হাসান নদভীর ইন্তেখাবে হাদিস-এর ভূমিকার আলোকে।

২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.: মৃত্যু ৬৮হি. বয়স ৭১ বছর, হাদিস বর্ণনার সংখ্যা- ২৬৬০।
৩. আয়েশা সিদ্দীকা রা.: মৃত্যু ৫৮হি. বয়স ৬৮ বছর, হাদিস বর্ণনার সংখ্যা- ২২১০।
৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.: মৃত্যু ৭৩হি. বয়স ৮৪ বছর, হাদিস বর্ণনার সংখ্যা- ১৬৩০।
৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.: মৃত্যু ৭৮হি. বয়স ৯৪ বছর, হাদিস বর্ণণার সংখ্যা- ১৫৬০।
৬. আনাস ইবনে মালেক রা.: মৃত্যু ৯৩হি. বয়স ১০৩ বছর, হাদিস বর্ণনার সংখ্যা ১২৮৬।
৭. আবু সাঈদ খুদরি রা.: মৃত্যু ৭৪হি. বয়স ৮৪ বছর। তাঁর হাদিস বর্ণনার সংখ্যা- ১১৭০।

এঁরা হলেন সেইসব মহান সাহাবী যাঁদের হাজারের অধিক হাদিস মুখস্ত ছিলো। এছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. মৃত্যু ৬৩হি.; আলী রা. মৃত্যু ৪০হি.; উমর রা. মৃত্যু ২৩হি. সেসব সাহাবীদের ক'জন যাদের বর্ণনা পাঁচশ থেকে হাজার পর্যন্ত পৌঁছেছে।

এমনি করে আবু বকর সিদ্দীক রা. মৃত্যু ১৩হি.; উসমান রা. মৃত্যু ৩৬হি.; উম্মে সালামা রা. মৃত্যু ৫৯হি.; আবু মূসা আশয়ারী রা. মৃত্যু ৫২হি.; আবুযর গিফারী রা. মৃত্যু ৩২হি.; আবু আইয়ুব আনসারী রা. মৃত্যু ৫১হি.; উবাই ইবনে কা'ব রা. মৃত্যু ১৯হি. এবং মুয়ায ইবনে জাবাল রা. মৃত্যু ১৮হি. সেসব সাহাবী যাঁরা একশ' থেকে পাঁচশ' হাদিস বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া এ যুগের কতিপয় সেরা তাবেয়ী রয়েছেন, হাদিস শাস্ত্রের ইতিহাসে যাদের স্বর্ণোজ্জল ভূমিকা চির-ভাস্বর। এঁদের ক'জনের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. সায়ীদ ইবনে মুসায়্যেব। উমর ফারূক রা.-এর খেলাফতের দ্বিতীয় বছর ইনি মদিনায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

   উসমান, আয়েশা, আবু হুরায়রা এবং যায়েদ ইবনে সাবেত রা. থেকে তিনি হাদিসের শিক্ষা লাভ করেন।

২. উরওয়া ইবনে যুবায়ের। ইনি মদিনার শ্রেষ্ঠ আলেমদের একজন। তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশার বোন আসমা বিনতে আবু বকর রা.-এর পুত্র। মুহতারামা খালা আয়েশা রা. থেকে তিনি অধিকাংশ হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবু হুরায়রা রা. এবং যায়েদ ইবনে সাবিত রা. থেকেও তিনি হাদিস শিক্ষা গ্রহণ করেন।

   সালেহ ইবনে কাইসান এবং ইমাম ইবনে শিহাব যুহরীর মতো বিজ্ঞ আলেমগণ ছিলেন তাঁর ছাত্র। ৯৪ হিজরিতে তিনি ইহকাল ত্যাগ করেন।

৩. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.। ইনি মদিনার প্রখ্যাত সাতজন ফকীহ্‌র একজন। পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে হাদিস শিক্ষা গ্রহণ করেন। অন্যান্য সাহাবীগণ থেকেও তিনি হাদিসের শিক্ষা লাভ করেন। নাফে, যুহরি ও অন্যান্য মশহুর তাবেয়ীগণ ছিলেন তাঁর ছাত্র। ১০৬ হিজরিতে তিনি পরলোক গমন করেন।

৪. নাফে: ইনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর আযাদকৃত গোলাম। ইবনে উমরের তিনি ছিলেন খাস শাগরেদ এবং ইমাম মালেকের ছিলেন তিনি উস্তাদ। মুহাদ্দিসগণের নিকট এ সনদ অর্থাৎ 'মালেক-নাফে-আবদুল্লাহ ইবনে উমর-রসূলুল্লাহ সা.' সোনালি সনদ (সূত্র) বলে গণ্য। ১১৭ হিজরিতে নাফে ইন্তেকাল করেন।

প্রথম অধ্যায়ে হাদিসের লিখিত সম্পদগুলো নিম্নরূপ:

০১. সহীফায়ে সাদিকা: এ সংকলনটি সংগ্রথিত করেন আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস্ রা.। মৃত্যু ৬৩হি., বয়স ৭৭ বছর। লেখা ও সংকলনের কাজে তাঁর ছিলো দারুণ আগ্রহ। রসূল সা. থেকে যা কিছু শুনতেন, তিনি সবই লিখে রাখতেন। এ ব্যাপারে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সা. তাকে অনুমতি প্রদান করেছিলেন।[১৯] এটিতে প্রায় এক হাজার হাদিস সংগ্রথিত হয়েছে। সহীফাটি দীর্ঘদিন তাঁর খান্দানের হাতে সংরক্ষিত ছিলো। এ সবগুলো হাদিস মুসনাদে আহমদে সংকলিত হয়েছে।

০২. সহীফায়ে সহীহা: এটি সংকলন করেছেন হাম্মাদ ইবনে মুনাব্বাহ (মৃত্যু ১০১হি.)। ইনি আবু হুরায়রার একজন মশহুর ছাত্র। আবু হুরায়রার বর্ণনা সমূহ তিনি সংগ্রথিত করেন। তাঁর পান্ডুলিপি বার্লিন এবং দামেস্কের গ্রন্থাগারে মওজদু রয়েছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মুসনাদে এর সবগুলো হাদিস 'আবু হুরায়রা' শিরোনামে সংগ্রথিত হয়েছে।[২০] গত শতাব্দীতে সহীফাটি ড. হামিদুল্লাহ্‌র প্রচেষ্টায় মুদ্রিত হয়ে হায়দ্রাবাদ দক্ষিণ থেকে প্রকাশিত হয়। এতে মোট ১৩৮টি হাদিস রয়েছে।

এ সহীফাটি আবু হুরায়রার সমস্ত বর্ণনার একটা অংশ মাত্র। এর অধিকাংশ বর্ণনা সহীহ বুখারি ও এবং সহীহ মুসলিমে পাওয়া যায়।

০৩. আবু হুরায়রার আরেকজন শাগরেদ বশীর ইবনে নাহীফও কতিপয় হাদিস সংগ্রথিত করেন। শিক্ষাগ্রহণ শেষে তিনি সংকলনটি আবু হুরায়রাকে শুনিয়ে সত্যতা প্রমাণিত করে নেন।[২১]

০৪. মুসনাদে আবু হুরায়রা রা.: সাহাবাগণের যুগেই এটি লেখা হয়। মিশরের গভর্ণর উমর ইবনে আবদুল আযীযের পিতা আবদুল আযীয ইবনে মারওয়ানের (মৃত্যু-৮৬হি.) নিকট এর একটি কপি

---

১৯. মুখতাসার জামে বয়ানুল ইল্‌ম খন্ড ৩৬, পৃষ্ঠা ৩৭।
২০. বিস্তারিত জানার জন্যে ড. হামীদুল্লাহ সম্পাদিত সহীফায়ে হাম্মাদের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
২১. সহীফায়ে হাম্মাদের ভূমিকা, পৃ. ৫০।

মওজুদ ছিলো। তিনি কাসীর ইবনে মুররাহকে লিখেছেন, তোমার নিকট সাহাবায়ে কিরামের যেসব হাদিস রয়েছে, সেগুলো লিখে পাঠাও। তবে আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদিসমূহ পাঠানোর প্রয়োজন নেই। কারণ সেগুলো আমার নিকট মওজূদ রয়েছে।[২২]

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার স্বহস্তে লিখিত মুসনাদে আবু হুরায়রার একটি কপি বর্তমানে জার্মানীর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।[২৩]

০৫. সহীফায়ে আলী রা.: ইমাম বুখারির ব্যাখা ও বর্ণনা থেকে বুঝা যায় এ সংকলনটি যথেষ্ট বড় ছিলো।[২৪] এতে যাকাত, মদীনার মর্যাদা, বিদায় হজের ভাষণ এবং ইসলামি বিধান সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ সংগ্রথিত ছিলো।

০৬. রসূল সা.-এর লিখিত বক্তৃতা: মক্কা বিজয়কালে রসূল সা. আবু শাহ্মা ইয়ামানীর আবেদনক্রমে তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা লিখার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২৫] এতে মানবাধিকার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে।

০৭. সহীফায়ে জাবির রা.: জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্র ছাত্র ওহাব ইবনে মুনাববাহ (মৃত্যু ১১০হি.) ও সুলাইমান ইবনে কায়েস লশকরী তাঁর বর্ণনাসমূহকে সংগ্রথিত করেন।[২৬] এতে লিপিবদ্ধ ছিলো হজের নিয়ম-কানুন ও বিদায় হজের ভাষণ সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ।

০৮. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-এর বর্ণনা সমূহ: আয়েশা রা.-এর বর্ণনাসমূহ তাঁর শারগেদ ও বোনপো উরওয়া ইবনে যুবায়ের লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিলেন।[২৭]

০৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদিস সমূহ: ইবনে আব্বাসের রা. বর্ণনাসমূহের কয়েকটি সংকলন ছিলো। তাবেয়ী সায়ীদ ইবনে জুবায়ের তাঁর বর্ণনাসমূহ লিপিবদ্ধ করেন।

১০. সহীফায়ে আনাস ইবনে মালেক: সায়ীদ ইবনে হেলাল বলেন, আনাস রা. তাঁর লিখিত হাদিস সমূহ বের করে আমাদের দেখাতেন এবং বলতেন এসব হাদিস আমি স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সা. থেকে শুনে লিখে নিয়েছি।[২৮]

১১. আমর ইবনে হাযম: রসূলুল্লাহ সা. তাঁকে ইয়েমেনের গভর্ণর নিযুক্ত করে পাঠাবার সময় একটি লিখিত নির্দেশনামা প্রদান করেন। আমর এ নির্দেশনামা শুধু সংরক্ষণই করেননি, বরঞ্চ তার সাথে রসূল সা.-এর আরো ২১টি ফরমান যুক্ত করে একটি সুন্দর গ্রন্থ তৈরি করেছিলেন।[২৯]

---

২২. তিরমিযির শরাহ 'তুহফাতুল আহওয়াযীর' ভূমিকা-পৃ. ১৬৫।
২৩. তিরমিযির শরাহ 'তুহফাতুল আহ্ওয়াযীর' ভূমিকা- পৃ. ১৬৫।
২৪. সহীহ বুখারি : কিতাবুল ইতেসাম বিল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহ : ১ম খন্ড ৪৫১পৃ.।
২৫. সহীহ বুখারি ১ম খন্ড পৃ.২০; মুখতাসার জামেউল ইল্ম পৃ.৩৬; সহীহ মুসলিম ১ম খন্ড পৃ. ৪৩৯।
২৬. ইবনে হাজর আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব : ৪র্থ খন্ড ২১৫পৃ.।
২৭. ইবনে হাজর আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব : ৭ম খন্ড ২১৫পৃ.। দারমী ৬৮পৃ.।
২৮. সহীফা হাম্মাদের ভূমিকা : পৃ. ৩৪।
২৯. ড. হামীদুল্লাহ, আল ওয়াসেকুস সিয়াসাহ : পৃ. ১০৫।

১২. রিসালায়ে সামুরা ইবনে জুনদুব: উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর পুত্র এটি লাভ করেছিলেন। এতে অনেকগুলো বর্ণনা গ্রন্থাবদ্ধ ছিলো।[৩০]

১৩. সহীফায়ে সাআদ ইবনে উবাদাহ: ইনি রসূলের একজন সাহাবী ছিলেন। জাহেলি যুগ থেকেই তিনি লেখা পড়া জানতেন।

১৪. মাকতুবাতে নাফে: সুলাইমান ইবনে মূসা বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে তাঁর গোলাম নাফে হাদিস শুনে লিখে রাখতেন।[৩১]

১৫. মায়ান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের পুত্র আবদুর রহমান আমার সামনে কিতাব হাতে নিয়ে হলফ করে বলেছেন: এটা আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিজ হাতে লেখা হাদিসের কিতাব।[৩২]

খ. দ্বিতীয় অধ্যায়

হাদিস সংগ্রহ ও হিফাযতের দ্বিতীয় অধ্যায় প্রায় হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর অর্ধেককাল পর্যন্ত চলে। এ অধ্যায়ে একদল বিরাট সংখ্যক তাবেয়ী তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন, যারা লিখিত হাদিস ভান্ডারকে আরো সমৃদ্ধ ও ব্যাপকতর করেন।

এ যুগের হাদিস সংগ্রহকারীগণ হলেন:

মুহাম্মদ ইবনে শিহাব যুহরি। মৃত্যু ১২৪হি.। নিজ যুগের খ্যাতনামা ও শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের মধ্যে ইনি ছিলেন একজন। তিনি হাদিস শিক্ষা লাভ করেন সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আনাস ইবনে মালেক, সহল ইবনে সায়াদ রা. এবং তাবেয়ী সায়ীদ ইবনে মুসায়্যেব, মাহমুদ ইবনে রবী র. প্রমুখ মহান ব্যক্তিগণের নিকট থেকে।

ইমাম আওযায়ী, ইমাম মালেক এবং সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা প্রমুখ হাদিসের ইমামগণ ছিলেন তাঁর ছাত্র। ১০১ হিজরিতে উমর ইবনে আবদুল আযীয রা. তাঁকে হাদিস সংগ্রহের নির্দেশ দেন। এ ছাড়াও উমর ইবনে আবদুল আযীয মদিনার গভর্ণর মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনে হাযেমকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি যেনো উমারাহ বিনতে আবদুর রহমান এবং কাসেম ইবনে মুহাম্মদের নিকট সংরক্ষিত হাদিস সমূহ লিখে নেন।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-এর খাস শাগরেদদের একজন ছিলেন এই উমারাহ এবং কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ছিলেন তাঁর ভাইপো। আয়েশা রা. নিজ দায়িত্বে তাকে শিক্ষাদীক্ষা প্রদান করেন।[৩৩]

উমর ইবনে আবদুল আযীয কেবল এতোটুকু করেই শেষ করেননি বরঞ্চ গোটা ইসলামি রাষ্ট্রের অধঃস্তন দায়িত্বশীলদের তিনি হাদিস সংগ্রহ ও

---

৩০. ইবনে হাজর আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব ৪র্থ খন্ড ২৩৬পৃ.।
৩১. দারমী পৃ. ৬৯, সহীফায়ে হাম্মাদের ভূমিকা পৃ. ৪৫।
৩২. মুখতাসার জামেউল ইলম, পৃ. ৩৭।
৩৩. ইবনে হাজর আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব ৭ম খন্ড পৃ. ১৭২।

সংকলনের নির্দেশ প্রদান করে এ ব্যাপারে তাকিদ করতে থাকেন। যার ফলে দারুল খোলাফা দামেস্কে রাশি রাশি হাদিস এসে পৌছুতে থাকে। খলিফা এসব হাদিসের 'কপি' রাজ্যের আনাচে-কানাচে পৌঁছে দেন।[৩৪]

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে শিহাব যুহরির অনুসরণে সে যুগের অন্যান্য আলেমগণও হাদিস সংগ্রহ ও সংকলণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইমাম আবদুল মালেক ইবনে জুরাইজ (মৃত্যু ১৫০হি.) মক্কায়, ইমাম আওযায়ী (মৃত্যু ১৫৭হি.) সিরিয়ায়, মা'মার ইবনে রাশেদ (মৃত্যু ১৫৩হি.) ইয়েমেনে, ইমাম সুফিয়ান সওরী (মৃত্যু ১৬১হি.) কুফায়, ইমাম হাম্মাদ ইবনে সালামাহ (মৃত্যু ১৬৭হি.) বসরায় এবং ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (মৃত্যু ১৮১হি.) খোরাসানে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলণের কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

ইমাম মালেক ইবনে আনাস (জন্ম ৯৩হি. মৃত্যু ১৭৯হি.) ইমাম যুহরির পর মদিনার হাদিস সংকলন ও সম্পাদনা করেন। তিনি নাফে, যুহরি এবং অন্যান্য খ্যাতনামা আলেমগণের নিকট থেকে হাদিসের ইলম লাভ করেন। তিনি প্রায় নয়শত উস্তাদ থেকে হাদিসের শিক্ষা লাভ করেন। হিজায, সিরিয়া, ইরাক, ফিলিস্তিন, মিশর, আফ্রিকা এবং স্পেনের হাজার হাজার সুন্নতে রসূলের পিয়াসী লোক তাঁর নিকট থেকে সরাসরি হাদিসের শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম মালেক রা.-এর ছাত্রদের মধ্যে লাইছ ইবনে সায়াদ (মৃত্যু ১৭৫হি.), ইবনে মুবারক (মৃত্যু ১৮১), ইমাম শাফেয়ী (মৃত্যু ২০৪হি.), ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ্ শাইবানী (মৃত্যু ১৮৯হি.) প্রমুখ সুবিখ্যাত হাদিস বিশেষজ্ঞগণও রয়েছেন।

এ যুগে বহু হাদিস গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে ইমাম মালেকের মুয়াত্তার স্থান সর্বশীর্ষে। ১৩০ হিজরি থেকে নিয়ে ১৪১ হিজরির মধ্যে এ গ্রন্থটি সংকলিত হয়। এতে মোট ১৭০০ হাদিস রয়েছে। তম্মধ্যে ৬০০ মরফু, ২২৮ মুরসাল, ৬১৩ মওকুফ হাদিস এবং তাবেয়ীগণের ২৮৫টি কওল রয়েছে।

এ যুগের অন্য কয়েকটি সংকলনের নাম হচ্ছে- জামে সুফিয়ান সওরী (মৃত্যু ১৬১হি.), জামে ইবনে মুবারক (মৃত্যু ১৮১হি.), জামে' ইমাম আওযায়ী (মৃত্যু ১৫৭হি.), জামে ইবনে জুরাইজ (মৃত্যু ১৫০হি.), কিতাবুল খেরাজ ইমাম আবু ইউসুফ (মৃত্যু ১৮৩হি.), কিতাবুল আছার- ইমাম মুহাম্মদ (মৃত্যু ১৮৯হি.)।

গ. তৃতীয় অধ্যায়

এ অধ্যায় হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

---

৩৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফায ১ম খন্ড, পৃ. ১০৬; মুখতাসার জামেউল ইলম পৃ. ৩৮।

এক: এ যুগে রসূলে করিমের হাদিস থেকে সাহাবাগণের আছার ও তাবেয়ীগণের কওল (বাণী) বাদ দিয়ে তা পৃথকভাবে গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়।

দুই: নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহ আলাদাভাবে সংগ্রথিত করা হয়। এভাবে ব্যাপক যাচাই-বাছাই ও গবেষণা অনুসন্ধানের পর দ্বিতীয় যুগের সংকলন সমূহকে তৃতীয় যুগের বিরাট বিরাট গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়।

তিন: এ যুগে ব্যাপকভাবে কেবল হাদিস সংগ্রহ এবং সংগ্রথিতই করা হয়নি, বরঞ্চ গোটা ইল্‌মে হাদিসের হিফাযতের উদ্দেশ্যে মুহাদ্দিসগণ ইলমে হাদিস সংক্রান্ত শতাধিক শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের বুনিয়াদ স্থাপন করেন। এখন পর্যন্ত এসব বিষয়ে হাজার হাজার গ্রন্থ প্রণীত হয়ে আসছে। আল্লাহ তায়ালা এ মহান বুযুর্গগণের প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং তাঁদেরকে এর শুভ প্রতিদান প্রদান করুন।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে এখানে ইল্‌মে হাদিসের কয়েকটি শাখা প্রশাখার পরিচয় প্রদান করা গেলো:

এক: ইল্‌মে আসমাউর রিজাল: এ শাস্ত্রে হাদিস বর্ণনাকারীদের সার্বিক অবস্থা, জন্ম, জীবদ্দশা, শিক্ষক ও ছাত্রদের বিস্তারিত বিবরণ, শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে সফর এবং নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য হবার ব্যাপারে হাদিস বিশেষজ্ঞগণের ফায়সালা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এটি অত্যন্ত ব্যাপক, সিদ্ধান্তকরী ও আকর্ষণীয় শাস্ত্র। কোনো এক বিদ্বেষী প্রাচ্যবিদও একথার স্বীকৃতি না দিয়ে পারেননি যে, এ শাস্ত্রের মাধ্যমে পাঁচলক্ষ বর্ণনাকারীর সার্বিক জীবন চিত্র সংরক্ষিত হয়ে গেছে। মুসলমানদের এ কাজের নযীর আর অন্য কোনো জাতি পেশ করতে সক্ষম হয়নি।[৩৫]

এ শাস্ত্রের উপর অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে। দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ হলো:

১. তাহযীবুত তাহযীব: হাফেয ইবনে হাজর। ইনি সহীহ বুখারির ব্যাখ্যাতা। এ গ্রন্থটি ১২ খন্ডে সমাপ্ত।
২. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায: আল্লামা যাহাবী, মৃত্যু ৭৪৮হি.।

দুই: ইলমে মুসতালিহুল হাদিস: (উসূলে হাদিস)। এ শাস্ত্রের মাধ্যমে হাদিসের সহীহ ও জয়ীফ নির্ণয়ের নিয়ম কানুন জানা যায়।

'উলুমুল হাদিস' গ্রন্থটি এ শাস্ত্রের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কিতাব। এটি 'মুকাদ্দমায়ে ইবনে সিলাহ' নামে খ্যাত। এ কিতাবের প্রণেতা হচ্ছেন আবু আমর উসমান ইবনে সিলাহ (মৃত্যু ৫৭৭হি.)। হিজরি চৌদ্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উসূলে হাদিস সম্পর্কে দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। একটি হচ্ছে 'তাওজীহুন নযর'। লিখেছেন আল্লামা তাহের ইবনে সালেহ

৩৫. স্প্রীংগার : আল ইসাবা গ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকা, কলকাতা ১৮৬৪ঈসায়ী।

আল জাযায়েরি (মৃত্যু ১৩৩৮হি.)। অপরটি হচ্ছে 'কাওয়ায়িদূত তাহদীস'। লিখেছেন আল্লামা সাইয়েদ জালালুদ্দিন কাসেমী। প্রথমোক্তটি ব্যাপক তথ্য বহুল এবং শেষোক্তটি উত্তম বিষয় বিন্যাস সম্বলিত।

তিন: ইলমে আরীবুল হাদিস: এ শাস্ত্রে হাদিসের কঠিন শব্দ সমূহের বুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ শাস্ত্রে আল্লামা যমখশরির (মৃত্যু ৫৩৮হি.) 'আল ফায়েক' এবং ইবনে আসীরের (মৃত্যু ২০৬হি.) নেহায়া গ্রন্থদ্বয় খ্যাতি অর্জন করেছে।

চার: ইলমে তাখরীজুল আহাদিস: মশহুর তাফসির, ফিকাহ, তাসাউফ ও আকায়েদ গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত হাদিস সমূহ কার মাধ্যমে কোথা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে -এ শাস্ত্র দ্বারা তা অবগত হওয়া যায়। যেমন বুরহানুদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর আল মরগনানীর (মৃত্যু ৫৯২হি.) 'হিদায়া' গ্রন্থ এবং ইমাম গাযযালীর (মৃত্যু ৫০৫হি.) 'ইহ্ইয়াউল উলুম' গ্রন্থে এমন বহু হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে যেগুলোর বর্ণনা সূত্র কিংবা গ্রন্থ সূত্র কিছুই উল্লেখ নেই। এখন পাঠক যদি এসব হাদিসের শুদ্ধতা অশুদ্ধতা যাচাই বাছাই করতে চান, তবে তাকে হাফিয যিলয়ীর (মৃত্যু ৭৯২হি.) 'নসবুর রায়াহ' এবং হাফিয ইবনে হাজর আসকালানীর (মৃত্যু ৮৫২হি.) 'আদ্ দিরায়াহ' গ্রন্থদ্বয় অধ্যয়ন করতে হবে। অথবা পাঠক যদি এসব হাদিসের গ্রন্থ সূত্র জানতে চান, তবে তাকে হাফিয যয়নুদ্দীন ইরাকীর (মৃত্যু ৮০৬হি.) 'আল-মুগনী আল হিমলিল আসফার' গ্রন্থ দেখতে হবে।

পাঁচ: ইলমুল আহাদিসুল মওদূয়াহ: আলেমগণ এ শাস্ত্রে অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এ শাস্ত্রে 'মওদূ' (মনগড়া ও জাল) হাদিস সমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এ শাস্ত্রে কাজী শওকানীর (মৃত্যু ১২৫৫হি.) 'আল ফাওয়ায়িদুল মাজমুআ' এবং হাফিয জালালুদ্দীন সূয়ুতীর (মৃত্যু ৯১১হি.) 'আল্লায়ী আল মাস্নূআ' গ্রন্থদ্বয় খুবই খ্যাতি অর্জন করেছে।

ছয়: ইলমুন নাসেখ ওয়াল মানসুখ: এ শাস্ত্রে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মূসা হাযেমীর (মৃত্যু ৭৮৪হি.) গ্রন্থ 'কিতাবুল ই'তেবার' খুবই নির্ভরযোগ্য ও মশহুর। উল্লেখ্য, গ্রন্থকার মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

সাত: ইলমুত তাওফীক বাইনাল আহাদিসি: এ শাস্ত্রে সেসব হাদিসের সঠিক লক্ষ্য ও তাৎপর্য আলোচনা করা হয়েছে, বাহ্যত যেগুলোতে অনৈক্য ও বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয়। ইমাম শাফেয়ীই (মৃত্যু ২০৪হি.) সর্ব প্রথম এ বিষয়ে আলোচনা পেশ করেন। তাঁর এ সংক্রান্ত 'মুখতালিফুল হাদিস' প্রবন্ধটি খুবই মশহুর। ইমাম তোহাবীর (মৃত্যু ৩২১হি.) মুশকিলুল আসারও এ শাস্ত্রের একটি ফলপ্রসু গ্রন্থ।

আট: ইলমুল মুখতালিফ ওয়াল মু'তালিফ: এ শাস্ত্রে সে সব রাবী (বর্ণনাকারী) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যাদের নিজেদের প্রকৃত নাম, কুনিয়াত, উপাধি, বাপ-দাদার নাম কিংবা শিক্ষকের নাম সব

একাকার হয়ে রয়েছে। কারণ এমতাবস্থায় না জানা লোকেরা ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হতে পারেন। হাফিয ইবনে হাজরের 'তা'বীবুল মুনতাবাহ' এ শাস্ত্রে সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল গ্রন্থ।

নয়: ইলমুল আতরাফুল হাদিস: এ শাস্ত্র দ্বারা জানা যায় যে, অমুক হাদিসটি কোন্ গ্রন্থে রয়েছে এবং হাদিসটির বর্ণনা পরম্পরায় কোন্ কোন্ রাবী রয়েছেন। যেমন ধরুন: اِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ এ হাদিসটি আপনার জানা রয়েছ। এখন আপনি জানতে চান যে হাদিসটি কোন্ গ্রন্থে রয়েছে, পূর্ণ হাদিসটি কি এবং হাদিসটির বর্ণনাকারী কে? তখন, আপনাকে এ শাস্ত্রের সাহায্য নিতে হবে। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বড় গ্রন্থ হাফিয মুযীর (মৃত্যু ৭৪২হি.) 'তুহফাতুল আশরাফ'। এ গ্রন্থে সিহাহ সিত্তার হাদিস সমূহের পূর্ণ বিষয়সূচি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ গ্রন্থ হাফিয ইউসুফ মুযীর ২৬ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল।

দশ: ফিক্হুল হাদিস: এ শাস্ত্রে শরিয়তের হুকুম-আহকাম সংক্রান্ত হাদিস সমূহের হিকমাত ও তাৎপর্য সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে হাফিয ইবনুল কাইয়্যেমের (মৃত্যু ৭৫১হি.) 'ইলামুল মু'কিয়ীন' এবং শাহ অলি উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভীর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' খুবই উপকারী গ্রন্থ।

এছাড়া সুন্নাহ্কে শরিয়তের উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকারকারীদের ছড়ানো বিভ্রান্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে যেসব গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো খুবই ফায়দাদায়ক:

ইমাম শাফেয়ীর কিতাবুল উম সপ্তম খন্ড এবং আর রিসালাহ, আবু ইসহাক শাতেবীর (মৃত্যু ৭৯০হি.) আল মুওয়াফিকাত ৪র্থ খন্ড, হাফিয ইবনুল কাইয়্যেমের সওয়ায়েকে মুরসালাহ ২য় খন্ড, ইবনে হাযম উন্দুলুসীর (মৃত্যু ৪৫৬হি.) আল আহকাম, মওলানা বদরে আলম মীরাঠীর তরজুমানুস সুন্নাহ্র মুকাদ্দমা, হাকিম মাওলানা আবদুস সাত্তার উমপুরীর (মৃত্যু ১৯১৬ইসায়ী) ইসরাতুল খবর, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (মৃত্যু ১৯৭৯ঈসায়ী) সুন্নাত কী আইনী হাইসিয়াত, এছাড়া ইফতেখার আহমদ বলখীর ইনকারে হাদিসকা মান্যার আওর পস মান্জার গ্রন্থটিও এ ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান।

ইল্মে হদিসের ইতিহাস এবং এ সংক্রান্ত বিস্তারিত গবেষণা সম্বলিত যেসব গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলী খুবই তথ্যবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ: ১. হাফিয ইবনে হাজরের ফতহুল বারীর মুকাদ্দমা, ২. হাফিয ইবনে আবদুল বার উন্দুলুসীর (মৃত্যু ৪৬৩হি.) 'জামেউল বয়ানুল ইলম ওয়া আহলুহু', ৩. ইমাম হাকিমের (মৃত্যু ৪০৫হি.) 'মারিফাতুল উলূমুল হাদিস', ৪. এ বিষয়ে বর্তমান শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান মাওলানা আবদুর রহমান মুহাদ্দিস মুবারকপুরীর (মৃত্যু ১৯৩৫ঈসায়ী)

'মুকাদ্দামায়ে তুহফাতুল আহওয়াযী'। ৫. মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানীর 'ফতহুল মুলহিমের' ভূমিকা।

তৃতীয় অধ্যায়ের হাদিস সংকলকগণ: এ যুগের খ্যাতনামা হাদিস সংকলকগণ ও তাঁদের অমর অবদানসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদান করা গেলো:

এক: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪-২৪১হি.)। তাঁর অমর অবদান 'মুসনাদে আহমদ' নামে খ্যাত। ত্রিশ হাজার হাদিস সম্বলিত গ্রন্থটি চব্বিশ খন্ডে সমাপ্ত। উল্লেখযোগ্য সমস্ত হাদিসই প্রায় এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে একেক সাহাবীর বর্ণিত হদিস সমূহ তাঁর নামের সাথে ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে। শহীদ হাসানুল বান্নার পিতা আহমদ আবদুর রহমান সায়াতী এ গ্রন্থের বিষয়সূচি তৈরির কাজ করেন।

দুই: ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারি (১৯৪-২৫৬হি.)। ইমামের অমর অবদান হচ্ছে 'সহীহ আল বুখারি'। এছাড়াও ইমাম আরো অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। বুখারি শরীফের পূর্ণ নাম হচ্ছে "আল জামে আস সহীহ আল মুসনাদ আল মুখতাসার মিন উমূরে রাসূলিল্লাহি সা. ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়্যামিহি"।

ষোল বছর অবিরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে ইমাম বুখারি এ গ্রন্থ সংকলন সম্পন্ন করেন। নব্বই হাজার ছাত্র সরাসরি ইমাম বুখারির নিকট থেকে বুখারি শরিফের পাঠ গ্রহণ করেন। কোনো কোনো সময় তাঁর শিক্ষাদান মজলিসে ত্রিশ হাজার পর্যন্ত লোক উপস্থিত থাকতেন। এরূপ সমাবেশে তাঁর বক্তব্য সকলের কর্ণগোচর করার এম্‌লাকারীর (নামাযে মুকাব্বির যে কাজ করেন) সংখ্যাই থাকতো তিন হাজারের অধিক। বুখারিতে হাদিসের সংখ্যা ৯৬৮৪। কিন্তু পূনরুল্লেখ্য, সনদবিহীন হাদিস, সাহাবীদের বক্তব্য (আছার) এবং মুরসাল হাদিসসমূহ আলাদা করলে মোট মারফু' হাদিসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২৩। ইমাম বুখারি অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে বর্ণনাকারীদের যাচাই বাছাই করেন।

তিন: ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী (২০২-২৬১হি.)। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে ইমাম বুখারি এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলও ছিলেন। ইমাম তিরমিযি, ইমাম আবু হাতেম রাযী, আবু বকর ইবনে খাযীমা প্রমুখ তাঁর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উত্তম বিষয় বিন্যাসের দিক দিয়ে তাঁর সহীহ মূসলিম সর্বাপেক্ষা সুন্দর।

চার: ইমাম আবু দাউদ আশআস ইবনে সুলাইমান সিজিস্তানী (২০২-২৭৫হি.)। তাঁর অমর অবদান সুনানে আবু দাউদ। এ গ্রন্থে শরয়ী বিধি-বিধান সংক্রান্ত হাদিসসমূহ ব্যাপকভাবে সংগ্রথিত করা হয়েছে। ফিকহী আইন-বিধান ও মাসআলা-মাসায়েলের একটি উত্তম উৎস এ গ্রন্থ। এতে ৪৮০০ হাদিস সন্নিবেশিত হয়েছে।

পাঁচ: ইমাম আবু ঈসা তিরমিযি (২০৯-২৭৯হি.)। তাঁর অমর গ্রন্থ সুনানে তিরমিযিতে ফিক্‌হী মসলকসমূহের বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

ছয়: ইমাম আহমদ ইবনে শুয়াইব নাসাঈ (মৃত্যু ৩০৩হি.)। তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ নাসাঈ শরিফের মূল নাম 'আল সুনানুল মুজতবা'।

সাত: ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ কাযভীনি (মৃত্যু ২৭৩হি.)। তাঁর অমর অবদান 'সুনানে ইবনে মাজাহ'।

মুহাদ্দিসগণ বিশুদ্ধভাবে তারতম্য অনুযায়ী হাদিস গ্রন্থাবলীকে চারটি স্তরে বিভক্ত করেছেন:

প্রথম স্তর: ১. মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, ২. সহীহ বুখারি, ৩. সহীহ মুসলিম। এ তিনটি গ্রন্থই সনদের বিশুদ্ধতা ও বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততার দিক থেকে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

দ্বিতীয় স্তর: আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসাঈ, মুসনাদে আহমদ। এ গ্রন্থ সমূহের কোনো কোনো রাবী যদিও প্রথম স্তরের চেয়ে নিম্নমানের কিন্তু তাদেরকে নির্ভরযোগ্য গণ্য করা হয়।

তৃতীয় স্তর: দারেমি (মৃত্যু ২২৫হি.), ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, দারু কুতনি (মৃত্যু ৩৮৫হি.), তাবারানি (মৃত্যু ৩৬০হি.) তাহাবী (মৃত্যু ৩১১হি.), মুসনাদে শাফেয়ী, হাকেমের (মৃত্যু ৪০৫হি.) মুসতাদরাক। এসব গ্রন্থাবলীতে সহীহ জয়ীফ সর্ব প্রকারের হাদিসের সংমিশ্রণ রয়েছে। কিন্তু নির্ভরযোগ্য হাদিসের সংখ্যা অধিক।

চতুর্থ স্তর: ইবনে জরির তাবারির (মৃত্যু ৩১০হি.) গ্রন্থাবলী; খতিবে বাগদাদীর (মৃত্যু ৪৬৩হি.) গ্রন্থাবলী; আবু নঈম (মৃত্যু ৪০২হি.); ইবনে আসাকির (মৃত্যু ৫০৯হি.) ইবনে আব্দীর (মৃত্যু ৩৬৫হি.) কামিল; ইবনে মারদুইয়ার (মৃত্যু ৪১০হি.) সংকলনসমূহ এবং ওয়াকেদী (মৃত্যু ২০৭হি.) প্রমুখের গ্রন্থাবলী এ স্তরে গণ্য হয়ে থাকে। এসব গ্রন্থে সহীহ, জয়ীফ সব রকম হাদিসই রয়েছে। এমনকি 'মওদু' (মনগড়া) হাদিসও এসব গ্রন্থে ব্যাপক হারে রয়েছে। সাধারণ ওয়ায়েয, ইতিহাস ও কাহিনী লিখক এবং তাসাউফপন্থীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব গ্রন্থাবলীর আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। অবশ্য যাচাই বাছাই করে গ্রহণ করলে এসব গ্রন্থেও অনেক মনিমুক্তা রয়েছে। জয়ীফ ও মওদু হাদিসের গ্রন্থাবলীতে এগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

ঘ. চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম শতাব্দীর প্রায় প্রথম দিক থেকেই এ যুগের সূচনা হয় এবং তা এ যাবত অব্যাহত রয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ে হাদিস শাস্ত্রে যে কর্ম সম্পাদিত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

এক: হাদিসের প্রধান প্রধান গ্রন্থাবলীর শরাহ (ব্যাখ্যা) ও হাশীয়া (টিকা) লিখা হয়েছে এবং অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ হয়েছে।

দুই: ইলমে হাদিসের যেসব শাখা-প্রশাখার কথা উপরে আলোচিত হয়েছে, সেসব বিষয়ে বহু গ্রন্থাবলী রচিত হয়েছে এবং এসব গ্রন্থের ব্যাখ্যা, টীকা ও সারসংক্ষেপে লেখা হয়েছে।

তিন: আলেমগণ বিভিন্ন রকম দৃষ্টিভংগি সামনে রেখে তৃতীয় যুগে সংকলিত গ্রন্থাবলী থেকে বাছাই করা হাদিসসমূহের নির্বাচিত সংকলন তৈরি করেছেন। এসব নির্বাচিত সংকলনের কয়েকটির পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ক. মিশকাতুল মাসাবীহ: সংকলন করেছেন অলিউদ্দীন খতীব। এ গ্রন্থে আকায়িদ, ইবাদত, মুয়ামিলাত, আখলাক, আদব এবং হাশর নশর সম্পর্কিত হাদিসসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।

খ. রিয়াদুস সালেহীন: সংকলন করেছেন মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাতা ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবনে শরফ নববী (মৃত্যু ৬৭৬হি.)। আখলাক ও আদাব সংক্রান্ত হাদিসসমূহ এ গ্রন্থে অধিক সন্নিবেশিত হয়েছে।

গ. মুনতাকিল আখবার: এ গ্রন্থটি সংকলন করেছেন মুজাদ্দিদে দীন আবুল বারাকাত আবদুস সালাম ইবনে তাইমিয়া (মৃত্যু ৬৫২হি.)। ইনি ছিলেন বিখ্যাত মুজাদ্দিদ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়ার (৭২৮হি.) দাদা।

ঘ. বুলুগুল মারাম: এটি সংকলন করেছেন সহীহ বুখারির ব্যাখ্যাতা হাফেয ইবনে হাজর (মৃত্যু ৮৫২হি.)। ইবাদত ও মুয়ামিলাত সংক্রান্ত হাদিস সমূহ এতে অধিক স্থান পেয়েছে। 'সুবুলুস্ সালাম' নামে এ গ্রন্থের আরবি ব্যাখ্যা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল সুনআনী (মৃত্যু ১১৮২হি.)।

অবিভক্ত ভারতে সর্ব প্রথম ইলমে হাদিসের প্রদীপ প্রজ্জলিত করেন শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী ইবনে সাইফুদ্দীন তুর্ক (মৃত্যু ১০৫২হি.)। অতপর শাহ অলিউল্লাহ দেহলবী (মৃত্যু ১১৪৬হি.) ও তাঁর পুত্র, পৌত্র, প্র-পুত্র এবং শাগরেদদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে গোটা ভারতবর্ষ হাদিসের জ্যোতিতে আলোকময় হয়ে উঠে।

শাহ অলিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবীর পরে থেকে এ দেশে নির্বাচিত হাদিস সংকলন ও হাদিস-গুচ্ছ ব্যাপকভাবে গ্রন্থাবদ্ধ আকারে প্রকাশ পেতে থাকে।

এছাড়া হাদিস শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় গবেষণালব্ধ বহুগ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। বাংলা ভাষায় হাদিস গ্রন্থাবলী অনুদিত ও সংকলিত হয়েছে।

হাদিসে রসূল ও সুন্নতে রসূল সা. সম্পর্কে যারা কোনো প্রকার সন্দেহ পোষন করে কিংবা বিরূপ ধারণা পোষণ করে, সেটা হাদিস ও সুন্নাহ্ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক।[৩৬]

সমাপ্ত

---

৩৬. পুস্তিকাটি ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে রাজধানীর বিয়াম অডিটরিয়ামে প্রদত্ত লেখকের ভাষণ।